বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২২ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

স্মৃতির ভাস্যে বিজয় দিবস

জায়ীফা তাসনীম, সপ্তম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

তামজীদ এ নূর, সপ্তম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম লাল-সবুজের পতাকা। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে টালবাহানা করে। তারা ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে ট্যাংক, কামান, মেশিনগানসহ যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। বাড়িঘর-দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীর বাঙালি যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। যে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই পরাজিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর কোথাও এত বিপুল সংখ্যক সামরিক বাহিনীর সদস্যের আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেনি। আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ। হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি জাতি পায় স্বাধীনতার স্বাদ। তাই তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। বিজয় দিবস তাই বাঙালি জাতির জন্য, আমাদের জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল দিন।

বন্ধুরা, ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের যেমন আনন্দের দিন, খুশির দিন; তেমনি একটি বেদনার দিন ১৪ই ডিসেম্বর। স্বাধীনতার উষালগ্নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদরদের সহায়তায় দেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করতে বাসায় বাসায় হানা দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের ধরে এনে এ হত্যাকাণ্ড চালায়। জাতির শ্রেষ্ঠ এই সন্তানদের স্মরণে ১৪ই ডিসেম্বর আমরা 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করি। দিনটি বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে শোকাবহ এক বেদনার দিন। এই দিনে আমরা পরম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণ করি শহিদ বুদ্ধিজীবীদের।

বন্ধুরা, আমাদের পাশেই রয়েছে অনেক বন্ধু, যারা বিশেষ স্বভাবের। তাদেরকে আমরা প্রতিবন্ধী বলে থাকি। তারাও আমাদের বন্ধু, তারাও আমাদের সমাজের একজন। এই বিশেষ স্বভাবের বন্ধুদের প্রতি আমাদের বিশেষ যত্নবান হতে হবে। তাদের সাথে ভালো আচরণ করে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে হবে। আর এ লক্ষ্যেই ৩রা ডিসেম্বর পালিত হলো ৩১তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ও ২৪তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। জাতিসংঘ ঘোষিত এ দিবসটি ১৯৯২ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালন করা হচ্ছে।

শীত কিন্তু এসে গেছে বন্ধুরা। শীতের সময় সুস্থ থাকতে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। তাহলে শীতের আনন্দ উপভোগ করা যাবে। তাই এ সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। নিরাপদে ও সাবধানে থাকবে। আর নবারুণের সাথে থাকবে, তবেই মজার মজার বিষয় জানতে পারবে। তোমাদের জন্য সবসময় আমাদের শুভ কামনা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

স্মৃতির ভাষ্যে বিজয় দিবস/খালেক বিন জয়েনউদদীন ০৪
কেমন করে স্বাধীন হলো বাংলাদেশ/রফিকুর রশীদ ০৭
শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মদান/হাছিনা আক্তার ১৩
আমাদের গৌরবগাথা/মঈনুল হক চৌধুরী ১৭
বঙ্গবন্ধু, পাখির বন্ধু/অনুপম হায়াৎ ২০
বিদেশি বন্ধু পরম বন্ধু/বিনয় দত্ত ২৫

গল্প

গুলতি/মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী ১৫
বড়ো দিদি/খায়রুল আলম রাজু ২৩
কিশোর জয়নালের মুক্তিযুদ্ধ/জুয়েল আশরাফ ২৮
সাহসী ছেলে সোহাগ/জসীম আল ফাহিম ৩৩
পতাকার ছবি/নুরুল ইসলাম বাবুল ৩৮
দাদা ভাইয়ের রেডিও/আহমেদ সাব্বির ৪১
হাঁটুতে শেলের টুকরো/রহিমা আক্তার মৌ ৪৫
মুক্তিযোদ্ধা দাদুর গল্প/শিবুকান্তি দাশ ৪৯
বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবলু/নাসিম সুলতানা ৫২
মা আমি যুদ্ধে যাব/দিলরুবা নীলা ৫৭

সাফল্য প্রতিবেদন

বিজয়ের রঙে রঙিন/শাহানা আফরোজ ৬৮
আছি আমরাও/ফারুক আহম্মেদ খান ৭০
জাতীয় স্মৃতিসৌধের ইতিহাস/ইকবাল রেজা ৭১
ভারতের বিপক্ষে সিরিজ জয়/মেজবাউল হক ৭২
জয়ের স্বর্ণপালক/সিরাজ সালেহীন ৭৩
ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডে বাজিমাত/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৭৪
আইজেএসও প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ/আব্দুর রহমান ৭৪
নতুন পোলিও টিকা/মো. জামাল উদ্দিন ৭৫
থ্রিএমটি পুরস্কার আতিয়ার/জান্নাতে রোজী ৭৬
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি ৭৭

কবিতা ও ছড়া

০৩ কামাল চৌধুরী
১০ ওলি মুন্সী/শচীন্দ্র নাথ গাইন/বেগম শামসুন নাহার
১১ খোরশেদ আলম নয়ন/এমরান চৌধুরী
১২ নাহার আহমেদ/পরিতোষ বাবলু/গোলাম নবী পান্না
১৯ মো. কামাল শেখ
৩১ মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ/ মো. পারভেজ হোসাইন
৩২ ফরিদ সাইদ/বাবুল তালুকদার/ইশরাত আরা দ্যুতি
৪৪ নুসরাত জাহান/রাশেদ আহাম্মেদ সাদী/শাহ আলম বিল্লাল

ছোটোদের ছড়া/লেখা

৩০ সাবরিনা ইসলাম, ইরফান আহমেদ
৪৮ শাকিব হুসাইন/ফারিন আহমেদ/সামিন ইবনে মাহমুদ
৬৫ জাদুর ছাগল/ওয়াহিদ মুস্তাফা
৬৬ দেশ মাতাকে খুঁজে পেয়েছি/সারাফ নাওয়ার

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

৫৯ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : জায়ীফা তাসনীম/তামজীদ এ নূর
তৃতীয় প্রচ্ছদ : রাইশা ফারিহা/আভা আনজুম সুবাহ
শেষ প্রচ্ছদ : মানহা বিনতে মমিন
৪০ ইয়ানুর হোসেন
৪৫ ঐতিহ্য গোলদার
৫১ মুহসিনা রহমান
৬৬ স্বর্ণা রহমান
৬৭ স্বরণিকা সাহা
৭১ মানহা মামুন নামীরা
৭৩ সাজ্জাত হোসেন শান্ত
৭৬ ফারানাজ সিদ্দিকী
৭৯ আমিরা হক/মোসা. জীম আক্তার
৮০ জারীন তাসনিম জেবা/নাজিবা জান্নাত

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

বাল্যস্মৃতির বিজয় নিশান

কামাল চৌধুরী

তখন আমার বয়স কত
তোমার মতোই হবে
ঠাকুরমা'র গল্পগুলি
শেষ করেছি সবে ।

তোমার মতোই স্কুলে যাই
তোমার মতোই হাসি
তোমার মতোই সবুজ আলোয়
দেশটা ভালোবাসি ।

হঠাৎ দেখি দস্যু এল
গায়ের পোশাক খাকি
সবাই বলে হত্যাকারী
এদেরই নাম পাকি।

এই পাকিরা কামান দাগে
মেশিনগানের ঠা ঠা
আমরা বলি অনেক হলো
এবার তোদের টা টা।

ভুট্টো ইয়াহিয়ার পোলা
পাক-হানাদার খুনি-
ভয় করি না যুদ্ধ দিনে
বজ্রকণ্ঠ শুনি ।

আমার তখন বালক বয়স
তোমার মতোই হবে
রাতজাগা চোখ, ভাবছি দেশ
কখন মুক্ত হবে।

ডিসেম্বরে মুক্ত বাতাস
ফুল পাখিরা হাসে
বাল্যস্মৃতির বিজয় নিশান
উড়ছে আজও পাশে।

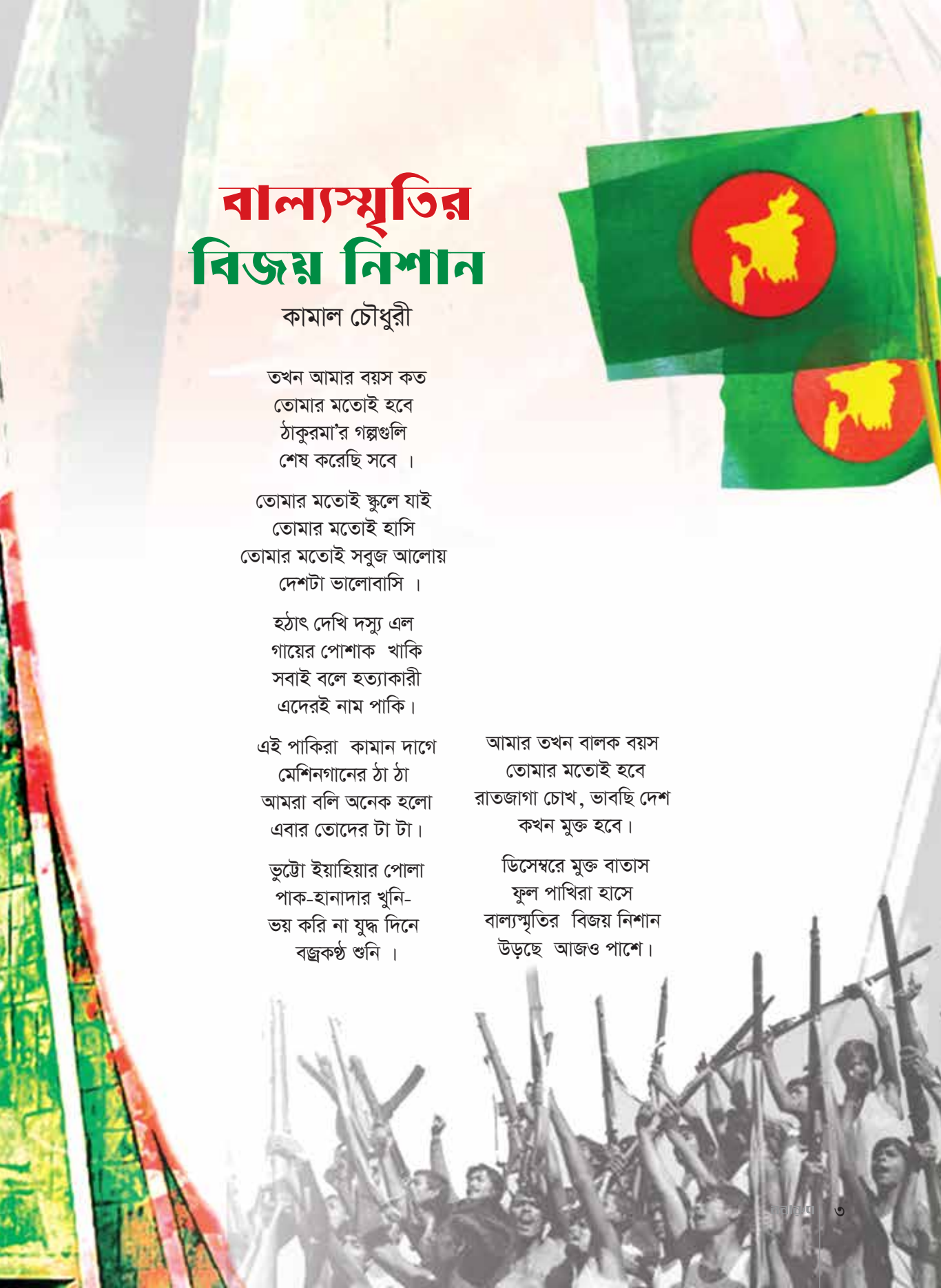

স্মৃতির ভাষ্যে বিজয় দিবস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

এ বছর বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবসটি একান্ন বছর পূর্ণ করল। আমরা এখনো যারা মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে আছি, তাদের কাছে মনে হয় একাত্তরের সেই যুদ্ধ কোনো রূপকথা নয়। আমরা যুদ্ধের মহানায়ক দক্ষিণ বাংলার গোপালগঞ্জ জেলার জলে ডোবা টুঙ্গিপাড়া গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পাকিস্তান নামক একটি দেশের দখলদার ঘাতক সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম নয়টি মাস। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে ভারত-রাশিয়ার মিত্রতায় সেই পাকিসৈন্যদের পরাস্ত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলাম ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।

সেই যুদ্ধ কোনো রূপকথা নয়, তা ছিল বাঙালি জনগোষ্ঠীর বাঁচা- মরার লড়াই। আমাদের কাছে রক্তে ধোয়া মরণপণ সমর। তবে হ্যাঁ বিশ বছর পরে যখন দৃশ্যমান কোনো মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে থাকবে না, আমাদের প্রজন্ম তখন মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘরে গিয়ে যুদ্ধের নিদর্শন দর্শন করবে এবং প্রামাণ্য দলিলপত্র ও বইপুস্তক পড়ে বলবেন–

'১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ দখলদার ইংরেজদের চালে দ্বিখণ্ডিত হয়। একখণ্ড পাকিস্তান। অন্য খণ্ড ভারত। আমাদের পূর্বসূরিরা স্বাধীনতা লাভ করে পাকিস্তানের অধীনতা স্বীকার করে। পাকিস্তানিরা এ জনপদ যার নাম প্রথমে পূর্ববাংলা পরে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়, সে অঞ্চলটিতে পাকি শাসকবর্গ উপনিবেশ সৃষ্টি করে। তারা আমাদের সবকিছু কেড়ে নেয়। নিদারুণ বৈষম্য সৃষ্টি

করে। এমনিতেই তারা ছিল ভিনভাটি। চেহারা সুরত, খাবারদাবার, আচার-আচরণ, চলাফেরা, সংস্কৃতি ছিল অধিকতর ভিন্ন। দু দেশের প্রকৃতিও ছিল পৃথক।

পাকিস্তান জিন্নাহ'র দ্বি-জাতিতত্ত্বের ফরমুলা সৃষ্টি হলেও আমরা ছিলাম অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও শোষিত। তারা আমাদের উৎপাদিত ফসলের অর্থ নিয়ে যেত পাকিস্তানে। আমাদের পাট, চা ও চামড়ার টাকায় গড়া হয়েছিল পরপর তিনটি রাজধানী-করাচি, পিন্ডি ও ইসলামাবাদ।

তারা ক্ষমতায় বসেই আমাদের মাতৃজবান কেড়ে নেবার সমূহ ফন্দি এঁটেছিল উনিশ'শ আটচল্লিশ সালের এগারোই মার্চ। মূলত মহান ভাষা আন্দোলনের খেই উন্মেষ পর্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই মুজিব ও ঢাকার তমদ্দুন মজলিসের অধ্যক্ষ আবুল কাসেম। এরপর ভাষা আন্দোলনের বায়ান্নর চূড়ান্ত পর্ব, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির-ছয় দফা কর্মসূচি, আটষট্টির আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের উভয় পাকিতে সাধারণ নির্বাচণ, নির্বাচনে বাঙালির নিরঙ্কুশ বিজয়, বাঙালিদের হাতে পাকি কর্তৃপক্ষের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা। শেষমেষ শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং দখলদার পাকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

এই পর্বে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের নির্দেশনা ও ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার আলোকে আওয়ামী লীগের বিজিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে ১০ই এপ্রিল সরকার গঠন, ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের মুক্ত এলাকায় ঐ সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এই সরকারের প্রধান ছিলেন পাকিতে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং একান্ত সারথি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান। তাদের দক্ষ পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে। শপথ অনুষ্ঠানের ভবেরপাড়া তখন মেহেরপুরেই। মেহেরপুরেই বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। কাজকর্ম করা হয় কলকাতার থিয়েটার রোড থেকে।

এই সময় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করে সাহায্যের ডালি নিয়ে পাশে দাঁড়ায় ভারত-রাশিয়াসহ বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষ। নয়টি মাস যুদ্ধ চলে। গ্রামবাংলায় গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। তারা মরণপণ লড়াই করে। যুদ্ধের সময় নরঘাতক পাকিসৈন্যের হাতে প্রাণ হারান ত্রিশ লক্ষ মানুষ, সম্ভ্রম হারান চার লক্ষ মা-বোন। মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তা দিতে এসে ভারতের প্রায় দুই হাজার মিত্র সৈন্য প্রাণ হারান।

এত প্রাণ ক্ষয়ে আমরা লাভ করেছিলাম স্বাধীনতা। পাকি সৈন্য ও এদেশীয় রাজাকার ও শান্তি কমিটির দফাদাররা ঢাকার রেসকার্স ময়দানে ১৬ই ডিসেম্বর বিকালে কম্বাইন্ড বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে হাতের অস্ত্র রেখে আত্মসমর্পণ পত্রে সই করেন পাকি জেনারেল নিয়াজী। সেদিন বিকালে ঢাকা মুক্ত হলেও আনন্দের মাঝে ছিল ভয়। পাকিদের হত্যাযজ্ঞ তখনো চলছিল। দেশ গেরামে অনেকেই জানেনি পাকিসৈন্যের যুদ্ধে ঠকার কাহিনি।

এমনকি ঢাকার ১৮ নম্বর (ধানমন্ডি) সড়কে পাকিদের হাতে বন্দি বঙ্গবন্ধু পরিবারকে মুক্তি দেয়নি নরঘাতক পাকিসৈন্যরা। যদিও গোটা বিশ্বে পাকি সৈন্যদের পতনের খবর স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী, বিবিসিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার হয়েছিল। অবশ্য পরেরদিন অর্থাৎ ১৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় মেজর তারার নেতৃত্বে একদল সৈন্য বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ রাসেলসহ অন্যদের মুক্ত করেন। আমরা ২০ জন বন্দী মুক্তিযোদ্ধা মুক্ত হই যশোর সেনানিবাসের H.Q থেকে ৭ই ডিসেম্বরের পরে। ঐ তারিখ থেকেই পাকি

সৈন্যেরা সেনানিবাস ছেড়ে পালাতে থাকে। বিজয়ের দিন ঢাকার চেয়ে খুলনা-যশোর ছিল বেশি উৎফুল্ল।

প্রবাসী সরকার তখনো কলকাতায়। বঙ্গবন্ধু পাকি কারাগারে। তখন সরকার ঢাকায় না আসা পর্যন্ত গেরিলা মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা দেশ পরিচালনা করে। তাদের সহযোগিতা করেন ভারতীয় মিত্র সৈন্যরা।

মুক্তিযুদ্ধের পরম বান্ধব ছিল ভারত-রাশিয়া। ভারত আমাদের ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়, খাদ্য দেয়, প্রশিক্ষণ দেয় ও অস্ত্র দেয়। ৩রা ডিসেম্বর তো সরাসরি আমাদের সাথে যুদ্ধে নেমে পড়ে। আর বিজয়ের অনেক আগে আগস্ট থেকে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে গোটা বিশ্ব চষে বেড়ান একাত্তরের মিত্রমাতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ৮ই জানুয়ারি তিনি পাকি থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন ও দিল্লিতে অবস্থান করেন। দশই জানুয়ারিই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় পূর্ণতা পায়।

মুক্তিযুদ্ধের এসব ঘটনা অতি বাস্তব হলেও ইতিহাসের আকর হয়ে বিরাজ করছে এখন। তবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী যাদের অনেকের ফাঁসি হয়েছে। তাঁদের কু-কর্ম বাংলার মানুষ চিরকাল ঘৃণার সাথে মনে রাখবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম শত বছর পরে আমাদের উত্তরসূরিরা মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব ঘটনাবলিকে মনে করবে কিংবদন্তী কিংবা রূপকথার ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর আজীবন সংগ্রাম, আন্দোলন, কারাবাস, ত্যাগ-তিতিক্ষার চূড়ান্ত পর্ব একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা স্বরাজ লাভ করেছি। বাংলা মাকে শৃঙ্খল মুক্ত করেছি। দুঃখ লাগে পর্দার আড়ালে থাকা একাত্তরের শত্রু বিভীষণরা মাতৃভূমির অর্জনকে নিয়ে কটাক্ষ করে ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। আমাদের রক্তে ধোয়া দেশটিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। জয়বাংলা। ■

গবেষক

কেমন করে স্বাধীন হলো বাংলাদেশ

রফিকুর রশীদ

সবুজে সবুজ শ্যামলে শ্যামল আমাদের এই দেশ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। অথচ বহু শতাব্দী ধরে এ দেশ ছিল পরাধীন। বিদেশি শাসকেরা এ দেশের মানুষের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে যুগের পর যুগ বছরের পর বছর শাসন-শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। সবশেষে দেড় হাজার মাইল দূরের পাকিস্তানিরা প্রতারণার মাধ্যমে এ দেশ দখল করে ২৩ বছর ধরে শাসন-শোষণ, জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। অন্যায়-অত্যাচার, শোষন-জুলুমের কোনো প্রতিবাদও করা যাবে না এমনই কঠোর এবং দমনমূলক ছিল তাদের শাসন-প্রশাসন। তাই বলে বাঙালি কখনো বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি সেই দুঃশাসন। মানুষের মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য বিভিন্ন সময়ে নিজেদের দাবি এবং অধিকারের কথা তারা বলেছে। রাস্তায় নেমে মিছিল করে স্লোগান দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাবার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালির কোনো দাবি কান পেতে শুনতে চায়নি, শক্তি প্রয়োগ করে বন্দুকের গুলি চালিয়ে সব দাবি সব আন্দোলন বন্ধ করে দিতে চেয়েছে।

প্রতিবাদের সূচনা হয় বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্ন থেকে। যে-কোনো দেশে বেশিরভাগ মানুষ কথা বলে যে ভাষায় সেটাই তো সেই দেশের রাষ্ট্রভাষা

হবার কথা। তখনকার সময়ে পাকিস্তান নামের দেশটির জনগণের মধ্যে বাঙালি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ আর বাংলাই ছিল অধিক মানুষের মুখের ভাষা। তাহলে সে দেশের রাষ্ট্রভাষা কেন বাংলা হবে না? উর্দু হবে, ইংরেজি হবে, শুধু বাংলাই হবে না? এ নিয়ে পাকিস্তানের সরকার কঠোর আইন জারি করে, সে আইনের প্রতিবাদও করা যাবে না। বাঙালি সেটা মানবে কেন? মাতৃভাষা যে তার কাছে মায়েরই সমান। মায়ের অপমান মানতে পারে কোনো সন্তান? বাঙালি সেই কালো আইন মানেনি। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছে, নিজেদের অধিকারের কথা বলেছে। কোনো কথা শোনেনি নির্মম শাসক। গুলি চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করে দমন করতে চেয়েছে বাঙালির দাবি।

শুধু ভাষা-আন্দোলনই নয়, বাঙালি জাতিকে আরো কত আন্দোলন যে করতে হয়েছে, সেসব এখন ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে তো আন্দোলন করেছেই, বাঙালিকে বাংলা নববর্ষ পালন এবং রবীন্দ্রচর্চার অধিকারের জন্যেও আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। মানুষ যে ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচন করবে, সরকার গঠন করবে সে উপায়ও মোটেই ছিল না। সেই দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়েই ছেষট্টি সালে ছয় দফার প্রশ্ন ওঠে, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান হয় এবং অবশেষে সত্তর সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবাধ সুষ্ঠু সেই নির্বাচনে বিজয় ঘটে বাঙালির, অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর দলকে নির্বাচিত করে। নির্বাচনে জয়লাভ করেও বাঙালির ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। আবার টালবাহানা আর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি আবার পথে নামে। পথে পথেই তারা ঘোষণা করে নিজেদের ঠিকানা : তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পাকিস্তানের সামরিক শাসক সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে নির্বাচনের রায় বানচালের অপচেষ্টা চালায়।

চরম এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় ১৯৭১ সালে তারা নিরীহ বাঙালির উপরে এক অন্যায্য অসম এবং ভয়াবহ নির্মম যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্তির জন্যে সে যুদ্ধকে গ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে। যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার এবং মরণপণ যুদ্ধের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার আহ্বান জানান। এমনই প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত জাতির সামনে তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। এরপর বর্বর পাকিস্তানি সৈনিকেরা তাঁকে রাতের অন্ধকারে গ্রেফতার করে সংগোপনে নিয়ে যায় পাকিস্তানের কারাগারে। নির্বোধ শাসকেরা ভেবেছিল শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে বাঙালির সব আন্দোলন-সংগ্রাম ভেঙে পড়বে। দমন পীড়নের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্খা ধ্বংস করে দেওয়া সহজ হবে। কিন্তু ইতিহাস বলে- বাস্তবে তেমনটি হয়নি। বরং ফল হয়েছে উলটো। নেতার অনুপস্থিতিও যে কখনো কখনো শারীরিক উপস্থিতির চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে, একাত্তরের রণাঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে। তিনি নেই তবু তাঁকেই প্রধান করে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়েছে। মুজিবনগরে সেই সরকার আত্মপ্রকাশ এবং শপথ গ্রহণ করেছে। যুদ্ধরত দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে। সোজা কথায় তাঁরই আহবানে বাঙালি জাতি ন'মাস ধরে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ত্রিশ লাখ শহিদের প্রাণের মূল্যে এবং দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিজয় অর্জন করে এবং প্রতিষ্ঠা হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

জন্মসূত্রে এখন আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা জানবেই না কেমন অপমান আর অমর্যাদার ছিল পরাধীনতার সেই অন্ধকার দিনগুলো। এখন এ দেশে সবাই স্বাধীন। কিন্তু কেমন করে স্বাধীন হলো আমাদের এই সোনার বাংলাদেশ, সে কথাও তোমাদের অনেকের পক্ষে জানা হয়ে ওঠেনি। অথচ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে এই গৌরবময়

ইতিহাস আমাদের সবারই জানা দরকার।

কেন জানা দরকার?

তোমাকে বড়ো করার জন্য, মানুষ করে তোলার জন্যে মা-বাবা, ভাই-বোন কিংবা সমাজের আরো অনেকে কত কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করেছে সেটা ভালোভাবে জানলে তুমিও তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে, তাদের জন্যে মায়া-মমতা ও ভালোবাসা অনুভব করবে। দেশও তো মায়ের মতোই। তাই দেশের স্বাধীনতার জন্যে কার কী রকম অবদান ছিল সেই ইতিহাসও আমাদের সবার জানা দরকার। আরো জানা দরকার স্বাধীনতা আমাদের কী দিয়েছে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী পেয়েছি, কেমন করে পেয়েছি। এ ইতিহাস জানলে ইতিহাস যারা তৈরি করেছে দেশের সেই বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগবে অন্তরে এবং দেশের জন্যেও গভীর মমতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে উঠবে। মাকে না চিনলে না ভালোবাসলে, মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন না করলে, তাকে কেমন সন্তান বলবে মানুষ? দেশের বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সুযোগ-সুবিধা-অধিকার-মর্যাদা ঠিকই ভোগ করব, অথচ স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানব না, তাই কী হয়? তাহলে নাগরিক হিসেবে দেশের প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠবে কীভাবে আর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধই বা জেগে উঠবে কেমন করে?

আজকের শিশু-কিশোররাই আগামী দিনের নাগরিক। স্বাধীন দেশের দায়িত্বশীল ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই তাদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস যথাযথভাবে উপস্থাপন করা জরুরি দরকার। কেবলমাত্র ক্লাসের পরে উঁচু ক্লাসে প্রমোশনের জন্যে পরীক্ষার পড়া মুখস্থের মাধ্যমে ইতিহাস জানা কিছুতেই যথেষ্ট হতে পারে না, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়বে– নিজেকে চেনার জন্যে, নিজেদের যা কিছু মহৎ অর্জন তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচবার জন্যে। বেড়ে ওঠার কালেই তার মেরুদণ্ডে শক্তি যোগাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। ■

কথাসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষক

ষোলোই দেশের মুক্তি

ওলি মুন্সী

ষোলো বর্ণের নামটি তোমার
ষোলোই জাতির শক্তি,
ষোলো আমার মহান বিজয়
স্বাধীনতার মুক্তি।

মুক্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছ
মুক্তিযুদ্ধের জন্য,
মুক্ত হলো বাংলা আমার
ধন্য স্বদেশ ধন্য।

তোমায় নিয়ে গান-কবিতা
তোমার যত জয়গান,
তুমি মহান বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

বিজয় কেতন

বেগম শামসুন নাহার

গর্ব করে বলি মোরা
বিজয় দেখি সোনায় মোড়া
বাংলার খোকা স্বপ্ন দেখায়
কণ্ঠে কণ্ঠে বিজয় শেখায়।

পেয়েছি আজ সাধের বাংলা
উচ্ছেদ করে পাকি জাংলা,
নাড়ির টানে মাটির কোলে
পাখপাখালি দোলনা দোলে।

বিজয় গাঁথায় মায়ের বুকে
মুখ লুকাবো মহাসুখে
ভালোবেসে আয়রে সবাই
লাল-সবুজের গান গাই।

বিজয়ের হাসি

শচীন্দ্র নাথ গাইন

হানাদার পাকসেনা নিষ্ঠুর অতি যে,
এ দেশের সম্পদ করেছিল ক্ষতি যে।
পঁচিশে মার্চ থেকে পশুগুলো মাতে যে,
গোলাগুলি তুলে নেয় নিজেদের হাতে যে।

ঘরবাড়ি ছারখার করে ওরা জ্বালিয়ে,
জান নিয়ে বাঁচা দায় সেই রাতে পালিয়ে।
ছেলেহারা মা কেঁদে করে আহাজারি যে,
শোকাকুল পরিবেশ বাতাসটা ভারি যে।

লোক মেরে দস্যুরা ফেটে পড়ে হাসিতে,
রক্তের বন্যায় দেশ থাকে ভাসিতে।
বাঙালিরা ময়দানে পড়ে শেষে ঝাঁপিয়ে,
শত্রুর ঘাঁটিগুলো দিতে থাকে কাঁপিয়ে।

ভয়হারা যোদ্ধারা বীর বেশে নামে যে,
হায়নার বাড়াবাড়ি সেই থেকে থামে যে।
পরাজয় মানে ওরা,সুখ ফিরে আসে যে,
বিজয়ের স্বাদ পেয়ে দেশমাতা হাসে যে।

এ দেশ আমার জন্মভূমি

খোরশেদ আলম নয়ন

এ দেশ আমার জন্মভূমি
এ দেশ সুখে-দুঃখে
আসলে মরণ-মরব এ দেশ
আগলে রেখে বুকে।

হায়না এসে বায়না ধরে
নেয় যে সবই লুটে
আঁধার ঘেরা কাঁটার বনে
আবার গোলাপ ফোটে!

আবার নদী ঢেউ তুলে যায়
দোলে কাশের বন
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি
উদাস করে মন।

তবু আবার গায় যে পাখি
চিরচেনা সুরে
লাল-সবুজের ও ঐ পতাকা
স্বপ্ন হয়ে উড়ে।

সূর্যোদয়

এমরান চৌধুরী

খোকন আমার মানিক আমার, শোনো দেশের গল্প
তোমার মতো যখন ছিল বয়স আমার অল্প
সেই সময়ে এই দেশটাকে করত শাসন ভিনদেশি
শাসনে নয় শোষণ করেই কাটত তাদের দিন বেশি।

প্রথম দিকে দেশের মানুষ সইছিল সব চোখ বুজে
বায়ান্নতে পেল তারা জবাব দেবার পথ খুঁজে
কদিন পরে দেখিয়ে দিলো তারা মোটেও নয় ভীরু
তারাও জানে বদলা নিতে এবং হতে শহিদ, হিরো।

গর্জে ওঠে আমজনতা একাত্তরের মার্চ মাসে
বৈরী মুখে ছাই ছিটালো বিষম ক্ষোভ ও উল্লাসে
লড়াই করে বীরের মতো বরণ করে মরণকে
ভাঙবে আগল করবে স্বাধীন মায়ের অন্তঃ ক্ষরণকে।

ধানের ক্ষেতে বন্যা নামে আমজনতার রক্তে
তার বদলে লাগল দোলা স্বৈরাচারের তখতে।
এক সকালে তাদের চোখে নামল ঘন অন্ধকার
দেখল তারা সামনে পিছে পালাবার সব বন্ধ দ্বার।

হারল শেষে সব পাকিরা হলো তাদের দুর্গলয়
দুখিনী মা'র চোখের জলে স্নান করে হয় সূর্যোদয়।

আমরা এখন স্বাধীন

নাহার আহমেদ

ছোট্ট একটু জায়গা নিয়ে
মানচিত্রে ঐ দাঁড়িয়ে
রয়েছে বাংলাদেশ ,
সুজলা সুফলা স্বপ্নমাখা
ছবির মতোন সত্যি আঁকা
আমার বাংলাদেশ ।
অস্ত্র হাতে একাত্তরে
বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে
বুকের রক্ত দিয়ে ,
নয়টি মাসের যুদ্ধ শেষে
ফিরলো ওরা বীরের বেশে
স্বাধীনতাকে নিয়ে ।
শত শহিদের রক্তমাখা
লাল-সবুজের ঐ পতাকা
অহংকারে উড়াই ,
আমরা এখন স্বাধীন
নাচি তাধিন তাধিন
এক সুরে গান গাই।

বিজয় পতাকা

গোলাম নবী পান্না

বিজয়ের হাসিটাকে
ভালোবাসি খুব
এমন এ ভাবনায়
দেই যেই ডুব–

কষ্টের ছবিটাই
ভেসে আসে দেখি
শেষ হবে না তো এই
নিয়ে লেখালেখি।

যুদ্ধের শেষে জানি
আসে এ বিজয়
মন থেকে কখনোই
মোছার তা নয়।

ষোলোই ডিসেম্বর
যেই ফিরে আসে
বিজয় পতাকা ওড়ে
আকাশে-বাতাসে।

দেশের ছবি আঁকি

পরিতোষ বাবলু

বাঁশবাগানের মাথার উপর
চাঁদটা যখন উঠে
রাতজোনাকি ছুটে
আঁধারও যায় টুটে!
আগাম ভোরে অই সুদূরে
সূর্যসকাল আসুক
গোমড়ামুখো হুতোমপ্যাঁচা
মিষ্টি করে হাসুক!

স্বপ্ন আছে মনের ভেতর
নীল আকাশের মতো
মুক্তিসেনার মা বলেছেন
দেশ গড়া হোক ব্রত।
আকাশ জুড়ে করুক খেলা
মুক্ত ডানার পাখি
স্বপ্নগাথা মনের পাতায়
দেশের ছবি আঁকি।

শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মদান

হাছিনা আক্তার

ছোট্ট বন্ধুরা, ১৪ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আমাদের এই মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এই বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের একটি বড়ো অংশকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে বিজয়ের আগমুহূর্ত পর্যন্ত তারা এই হত্যাযজ্ঞ চালায়।

আমাদের লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানি দুঃশাসনের দিনগুলোর বিরুদ্ধে বিবেকের কণ্ঠস্বর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। নিজেদের জ্ঞান-মনীষা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জাতিকে পথ দেখিয়েছেন, জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার কাজে অনুপ্রাণিত করেছেন। এসব কারণেই তারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের জিঘাংসার শিকার হয়েছেন। এত কম সময়ে এত বেশিসংখ্যক বুদ্ধিজীবী নিধনের উদাহরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্যতীত আর কখনো ঘটেনি।

বন্ধুরা, মুক্তিযুদ্ধের শেষ মুহূর্তে যখন দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী তাদের অনিবার্য পরাজয় টের পায়, তখন তারা জাতির বরেণ্য সন্তানদের হত্যার জন্য তালিকা করে ঘাতক বাহিনী আলবদর, আলশামসকে লেলিয়ে দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার অভিপ্রায়ে তারা চূড়ান্ত আঘাত হানে। যেসব বরেণ্য বুদ্ধিজীবীকে হারিয়েছি আমরা, তাঁদের মধ্যে আছেন মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. আলীম চৌধুরী, গোলাম মুস্তাফা, অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, রাশিদুল হাসান, ড.আনোয়ার পাশা, ড.

আবুল খায়ের, সেলিনা পারভীন প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধনের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে শুরু করে পাকিস্তানিরা। একাত্তরের ১০ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনিবাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে তুলে নিয়ে যায়। ২৫শে মার্চের কালরাতেই হানাদার বাহিনী অনানুষ্ঠানিকভাবে বুদ্ধিজীবী নিধন শুরু করে যা পুরো নয় মাসের যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পরেও অব্যাহত থাকে। চলচ্চিত্রকার ও গল্পকার জহির রায়হান নিখোঁজ হন ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারি মিরপুরে।

হত্যাকারীরা বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে কোনো বিশেষ ক্যাম্পে বা বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। শহরে জারিকৃত কারফিউর সুযোগে বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর চালানো হয়েছিল নির্মম নির্যাতন। বেয়নেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করা হয়েছিল দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। ঢাকা শহরে দুটি বধ্যভূমি ছিল। একটি ছিল মোহাম্মদপুরের কাছে রায়ের বাজারের জলাভূমি অপরটি ছিল মিরপুরে। যুদ্ধের পরে এ বধ্যভূমি দুটির ডোবা, নালা, ইটের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের গবেষকদের নিকট থেকে জানা যায়, এই হত্যাকাণ্ডের নীলনকশা প্রণয়ন করে জেনারেল রাও ফরমান আলী। ১২ই ডিসেম্বর সেনাসদর দফতরে আলবদর ও আলশামস বাহিনীর হাতে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তুলে দেন তিনি। পাকিস্তানি বাহিনীর ছত্রছায়ায় আধাসামরিক বাহিনী আলবদরের ক্যাডাররা এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। একাত্তরে ত্রিশ লাখ শহিদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী তাদের পরাজয় আসন্ন জেনে বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী নিধনের পরিকল্পনা করে। এটি ছিল এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ।

বন্ধুরা, আমরা সকলেই প্রকৃত ইতিহাস জানার চেষ্টা অব্যাহত রাখব। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা সকলে বাঙালি ও সংস্কৃতির চর্চা চালিয়ে যাওয়ায় ব্রতী হব এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করব। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্মৃতিময় সকল স্থাপনা যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রচারে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ আমাদের চিরদিন গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখতে হবে। ■

সিনিয়র সম্পাদক, নবারুণ ও সচিত্র বাংলাদেশ

গুলতি

মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী

গুলতি আর মার্বেল দিয়ে ঝাড়জঙ্গলে কতদিন পাখি মেরে বেড়িয়েছে ও। এটা যে অন্যায় কখনো তা মনে হয়নি। পাখিদের প্রতি বরাবরই অত্যাচার করে এসেছে ও। পাখিদের স্বাধীনতায় বার বার হস্তক্ষেপও করেছে। নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি করতে পারল অবশেষে। না,গুলতিটা আর ও রাখবে না। পাকুড় গাছের নিচে জমির আলে বসে হাতের গুলতিটা নাড়াচাড়া করতে করতে এসব ভাবে আরাফাত। এসব ভাবতে ভাবতে একসময় নিজেকে পাকহানাদার বাহিনীর মিলিটারি মনে হয় নিজেকে। পাখিদের কাছে সে তো পাক হানাদার বাহিনী ছাড়া মিত্র হতে পারে না। এসব ভেবে নিজের প্রতি নিজেকে ঘৃণা করে আরাফাত। এই গুলতি আর সে ব্যবহার করবে না কিছুতেই।

পাকহানাদাররা আরাফাতদের গ্রামে এসেছে বেশ

কয়েকদিন হলো। এসেই তারা ধংসলীলা চালালো। বাড়ি বাড়ি হামলা করে পাখির মতো গুলি করে মারল মানুষ। মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিলো। কাউকে কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করতে থাকল অনবরত। আরাফাতদের বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে হানাদাররা। বাড়িতে যখন আগুন লাগাচ্ছিল আরাফাতের বাবা অনেক কাকুতিমিনতি করেছিল যেন বাড়িটাতে আগুন না লাগায়। কিন্তু সে মিনতিতে কান দেয় নাই হানাদার বাহিনী। ঠুস্ ঠুস্ করে গুলি করে দেয় বাবাকে। বাবাকে বাঁচাতে মা সামনে এলে মা'কেও গুলি করে পাকহানাদার বাহিনী। আরাফাত তখন আমড়া পাড়তে আমড়া গাছে উঠেছিল। গাছের উপর থেকে নিজ চোখে অমানবিক দৃশ্যগুলো দেখেছে। ও হতবাক হয়ে গাছেই বসেছিল। কোনো শব্দ করার ভাষাও খুঁজে পায়নি।

মন খারাপ নিয়ে সে বাড়ির কাছে পাকুড় গাছের তলায় প্রায়ই এসে বসে থাকে। আজ গুলতি আর মার্বেলগুলো সাথে নিয়ে এসেছে। গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করা ওর প্রিয় শখ। গুলতিটাও অনেক প্রিয় ওর। গাছের ডাল কেটে বাবাই ওকে বানিয়ে দিয়েছিল গুলতিটা। এই গুলতিটা আর ব্যবহার করবে না ও। পাখিদের কাছে মিলিটারি হতে চায় না। বসে থাকতে থাকতে শুনল কে যেন ওকে বলে দৌড় দিলো,'পাগলা বসে আছিস কেন? পালিয়ে যাস না কেন?' লোকের মুখের দিকে তাকানোর সুযোগই হলো না। লোকটাকে শুধু দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখল ও। মিলিটারি আসার পর অনেকে অবশ্য গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। এখনো কেউ কেউ পালাচ্ছে। আরাফাতের পালিয়ে কী লাভ? তা আরাফাত জানে না। বাবাকে হারিয়েছে, মাকে হারিয়েছে। নতুন করে হারানোর কিছু আছে নাকি?

পাকুড় গাছতলায় বসে থাকতে থাকতে আরাফাত হঠাৎ দেখে একটা মিলিটারি তারই দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে। আরাফাতের ভয়ডর একদমই লাগল না। মিলিটারিটা সামনে এসে আরাফাতকে বলল,'এখান থেকে মীরবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে?' আরাফাত প্রশ্ন শুনে হা করে চেয়ে থাকল। উপলব্ধি করল এই মিলিটারি নিশ্চয়ই ওই লোকটাকে তাড়া করতে গিয়ে দল ছাড়া হয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। আরাফাত উত্তর–পূর্বকোণের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করল। কোনো কথা বলল না। মিলিটারিটা সেই পথে হাঁটতে থাকল। আরাফাত মন খারাপের মধ্যেও মুচকি মুচকি হাসতে থাকে গোপনে। কেননা ঐ জঙ্গলের ভিতরে দুরন্ত কয়েকজন টাইগার বাস করে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার। মানে জানো তো? মানে বাংলার বাঘ। মিলিটারিদের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাংলার বাঘ হয়ে কয়েকজন মুক্তিবাহিনীও এসেছে। এই মিলিটারির আর স্কুল ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। মিলিটারিটা চোখের আড়াল হওয়ার দশ মিনিটের ব্যবধানে আরও একজন মিলিটারিকে এদিকে আসতে দেখল আরাফাত। তাকে জিজ্ঞেস করল,'আমাদের একজন সৈন্য দল ছাড়া হয়ে হারিয়ে গেছে। এদিকে এসেছে কি না?' আরাফাত একই রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বলল,'এই পথে যেতে দেখেছি।' মিলিটারিটা পথে যেতে ধরে থেমে গেল। আরাফাতের দিকে ঝুঁকে গুলতিটা হাতে নিয়ে বলল,'এটা কী?'

আরাফাত বলল,'গুলতি। কেউ কেউ বাটুল বলে।'

মিলিটারিটা গুলতিটা নিয়ে উলটো দিকে ধরে গুলতি ছোড়ার চেষ্টা করল। মিলিটারিটার চেষ্টা সফল করার জন্য আরাফাত একটা মার্বেল বের করল। বোকা মিলিটারির হাতে উলটো দিকে গুলতি রেখে গুলতির ফিতায় মার্বেল রেখে ইচ্ছে মতো টেনে ধরল আরাফাত। গুলতিটা তখন মিলিটারিটার গলা বরাবর। মিলিটারিটা নিজেও জানে না কিছুক্ষণ পর কী হতে চলেছে। আরাফাত মার্বেলসহ ফিতাটা ঠাস্ করে ছেড়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফুটো হয়ে মার্বেলটা ঢুকে গেল গলার ভিতরে। ক্ষণিকের মধ্যে মিলিটারিটার নিথর দেহ পড়ে রইল পাকুড় গাছের তলায়।

মনটা ভালো হয়ে গেল আরাফাতের। গুলতিটা ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করল ও। গুলতি দিয়ে পাখি মারার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হলেও মিলিটারি মারার মধ্যে কোনো অপরাধবোধ জন্ম নিল না ওর মনে। বরং মিলিটারি মারার মধ্যে এক ধরনের সুখ আছে। আরাফাত ওর গুলতি নিয়ে ছুটল মুক্তিবাহিনীর কাছে। গুলতি নিয়ে ও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবে। ■

গল্পকার

আমাদের গৌরবগাথা

মঈনুল হক চৌধুরী

আমাদের বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবময় অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিশ লাখ শহিদের রক্ত, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম, অনেক চোখের জল আর ত্যাগের বিনিময়ে আমরা বাঙালি জাতি বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন ভূখণ্ড অর্জন করি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একদিকে যেমন করুণ, শোকাবহ, রোমহর্ষক, তেমনি ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ও বীরত্বপূর্ণ। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করি ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটে। যখন আমাদের দেশটা স্বাধীন ছিল না তখন আমাদের কোনো নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত ছিল না। তখন আমরা মুক্তভাবে আকাশে কোনো পতাকা উড়াতে পারতাম না, বুক ভরে গাইতে পারতাম না জাতীয় সঙ্গীত। আমরা ছিলাম পরাধীন। সেদিন আমাদের মনে ছিল অনেক কষ্ট। ছিল অনেক দুঃখ। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে এ দেশটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর পাকিস্তান দেশের শাসকরা ছিল অবাঙালি। ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলা স্বাধীনতা লাভ করলেও এ অঞ্চলের মানুষ ছিল অবহেলিত ও নির্যাতিত। পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ববাংলার মানুষকে ভালো চোখে দেখত না, এমনকি তারা আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে কেড়ে নেবার ফন্দি এঁটেছিল। কিন্তু বাংলার দামাল ছেলেদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা যথাযথ মর্যাদা লাভ করে। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালিদের বিপুল বিজয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ আরো

সুগম হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির কাছে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে। এ অবস্থায় ১৯৭১ এর ৭মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক মহাসমাবেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। পাকিস্তানিরাও তাদের দমন নীতির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। গোটা দেশে শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন। গণহত্যার জন্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ তারিখটা বেছে নিয়েছিল কারণ সে বিশ্বাস করত এটা তার জন্যে একটি শুভদিন। দুই বছর আগে এই দিনে সে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ রাতে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যার আদেশ দিয়ে সে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। জেনারেল ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীকে বলেছিল, ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে! গণহত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা অনেক আগে থেকে করা ছিল।

সেই নীল নকশার নাম 'অপারেশন সার্চলাইট।' সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে কেমন করে আলাপ আলোচনার ভান করে কালক্ষেপণ করা হবে, কীভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। শহরের প্রতিটি রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে দেরি হবে তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাত সাড়ে এগারোটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের কাজ শুরু করে দিলো। শুরু হলো পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। এই হত্যাযজ্ঞের যেন কোনো সাক্ষী না থাকে সেজন্যে সকল বিদেশি সাংবাদিককে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও সাইমন ড্রিং নামে একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরে লুকিয়ে এই ভয়াবহ গণহত্যার খবর ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে জানিয়েছিলেন। ঢাকা শহরের নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পাকিস্তান মিলিটারি সব বাঙালি অফিসারকে হয় হত্যা না হয় গ্রেপ্তার করে নেয়, সাধারণ সৈন্যদের নিরস্ত্র করে রাখে। পিলখানায় ইপিআরদেরকেও নিরস্ত্র করা হয়েছিল। তারপরেও তাদের যেটুকু সামর্থ্য ছিল সেটি নিয়ে সারারাত যুদ্ধ করেছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়নি এবং এই পুলিশবাহিনীই সবার আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সত্যিকার একটি যুদ্ধ শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আর জগন্নাথ হলের সব ছাত্রকে হত্যা করল। হত্যার আগে তাদের দিয়েই জগন্নাথ হলের সামনে একটি গর্ত করা হয়, যেখানে তাদের মৃতদেহকে মাটি চাপা দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রদের নয়, সাধারণ কর্মচারী এমনকি শিক্ষকদেরকেও তারা হত্যা করে। আশপাশে যে বস্তিগুলো ছিল সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে মেশিনগানের গুলিতে অসহায় মানুষগুলোকে হত্যা করে। এরপর তারা পুরনো ঢাকার হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলো আক্রমণ করে, মন্দিরগুলো গুঁড়িয়ে দেয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। যারা পালানোর চেষ্টা করেছে সবাইকে পাকিস্তানি মিলিটারি গুলি করে হত্যা করেছে।

২৫শে মার্চ ঢাকা শহর ছিল নরকের মতো, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে আগুন আর আগুন, গোলাগুলির শব্দ আর মানুষের আর্তচিৎকার। অপারেশন সার্চলাইটের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া। আগেই খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের সব নেতাকে সরে যাবার নির্দেশ দেন। আর নিজে বসে রইলেন নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে। সেদিন রাতে গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেন। তাঁর অগ্নিঝরা ডাকে আপামর জনগণ দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ রাত ১২.২০মিনিটে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন-'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে, তা নিয়ে সেনাবাহিনীর দখলকারীর মোকাবেলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত

করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।' এ ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ট্রান্সমিটারে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রেরিত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার অপরাধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৬শে মার্চ রাত ১.১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডি ৩২নং বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা সেনানিবাসে পরে সেখান থেকে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ইয়াহিয়া খান এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকেই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্, পুলিশ, আনসার, সেচ্ছাসেবক ছাত্র ও সাধারণ জনতার অংশগ্রহণে গঠিত মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দেশকে স্বাধীন করা এবং মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করার জন্য কর্নেল (অব:) আতাউল গনি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। শত্রুকবলিত এলাকাকে ১১টি অঞ্চলে ভাগ করে, নৌ অঞ্চল বাদে বাকি দশটি অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয় এক একজন অধিনায়কের ওপর। তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে দেশটির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই দেশ হচ্ছে ভারত। এই দেশটি প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ আর আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিল।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় দেড় হাজার সৈনিক প্রাণ দিয়েছিল। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী অনেক বাঙালি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরি করেছেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হয়। এদিনেই পাকিস্তানি নরঘাতকেরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে পরাজয় বরণ করে নেয়। নয় মাস পাকিস্তান কারাগারে বন্দী থাকার পর মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলার মাটিতে ফিরে এলেন। দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। এভাবে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, যার নাম বাংলাদেশ। সাথে পেয়েছি প্রিয় লাল-সবুজের পতাকা ও একটি হৃদয়ছোঁয়া জাতীয় সঙ্গীত। আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলাদেশের সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। বিজয়ের এই দিনে দেশ ও জাতির জন্য ভালো ভালো কাজ করার শপথ নিতে হবে আমাদের। তবেই তো আমাদের বিজয়ের তাৎপর্য মহিমান্বিত হবে। কারণ, বিজয় দিবস আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। ■

শিশুসাহিত্যিক

পূণ্য ভূমি

মো. কামাল শেখ

স্বাধীনতায় তাদের হৃদয় লীন ছিল,
মৃত্যু-ক্ষুধা-ভয়-ভীতি বিলীন ছিল।
কারণ তাদের কণ্ঠে ছিল মাটির সুর,
বজ্র শপথ জয়োল্লাসে সমুদ্দুর।
ত্যাগের স্মৃতি হৃদয়পটে নিরন্তর,
শোধ হবে না রক্তেরও ঋণ জীবনভর ?
শহিদ ভাইয়ের রক্তে রঙিন সবুজ ঘাস,
পূণ্য ভূমির সেই জমিনে আমার বাস।

বঙ্গবন্ধু, পাখির বন্ধু

অনুপম হায়াৎ

পশুপাখি আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি। এগুলো প্রকৃতি ও মনুষ্য সমাজের জন্য নানাভাবে উপকারী। এরা যেমন সৌন্দর্যের উপাদান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী, তেমন মুক্ত জীবনের প্রতীক। বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন লেখায় পশুপাখি সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশেষ করে তাঁর 'কারাগারের রোজনামচা'য় (২০১৭)। জেল জীবনে তিনি মোরগ-মুরগি, কবতুর, কাক, চড়ুই ও হলদে বর্ণের পাখির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জেলখানায় বন্দি অবস্থায় মোরগ-মুরগি, কবুতর পুষতেন, হলুদ রঙের পাখির সাথে সখ্যতা গড়েছেন। এসবের প্রতিপালন ও যত্ন করা এবং এদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার মধ্যে তিনি স্নেহ-মায়া-মমতা এবং মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন।

কবুতর

বঙ্গবন্ধু 'কারাগারের রোজনামচা'য় ওই দু'টো হলুদ পাখি ছাড়া কবুতর এবং কাক সম্পর্কেও লিখেছেন।

'যে কয়টা কবুতর আমার বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে তারা এখানে বাচ্চা দেয়। কাউকেও আমি ওদের ধরতে দেই না। সিপাহি জমাদার সাহেবরাও ওদের কিছু বলে না। আর বাচ্চাদেরও ধরে নিয়ে যায় না। বড়ো হয়ে উড়ে যায়। কিছুদিন ওদের মা-বাবা মুখ দিয়ে খাওয়ায়। তারপর যখন আপন পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখে এবং মা-পায়রার নতুন ডিম দেওয়ার সময় হয় তখন ওই বাচ্চাদের মেরে তাড়াইয়া দেয়। আমি অবাক হয়ে ওদের কীর্তিকলাপ দেখি।' (পৃ: ২১৯)

কাক

বঙ্গবন্ধু তাঁর ডায়েরিতে জেলখানার কাক সম্পর্কে সুন্দর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তিনি কাকদের আখ্যায়িত করেছেন দক্ষ কারিগর, ধৈর্য্যশীল, অধ্যবসায়ী এবং ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী হিসেবে। তিনি লিখেছেন-

'কাকের কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। আমার সামনের আম গাছ কয়টাতে কাক বাসা করতে আরম্ভ করে। আমি বাসা করতে দেবো না ওদের। কারণ ওরা পায়খানা করে আমার বাগান নষ্ট করে, আর ভীষণভাবে চিৎকার করে। আমার শান্তি ভঙ্গ হয়।

আমি একটা বাঁশের ধনুক তৈয়ারি করে মাটি দিয়ে গুলি তৈয়ার করে নিয়েছি। ধনুক মেরেও যখন কুলাতে পারলাম না তখন আমার বাগানী কাদের মিয়াকে দিয়ে বার বার বাসা ভেঙে ফেলি। বার বারই ওরা বাসা করে। লোহার তার কি সুন্দরভাবে গাছের সাথে পেঁচাইয়া ওরা বাসা করে। মনে হয় ওরা এক একজন দক্ষ কারিগর, কোথা থেকে সব উপকরণ যোগাড় করে আনে আল্লাহ জানে। পাঁচটা আম গাছ থেকে ৫/৭ বার করে বাসা ভেঙে ফেলি, আর ওরা আবার তৈরি করে। ওদের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দেখে মনে মনে ওদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হই। তিনটা গাছ ওদের ছেড়ে দিলাম-ওরা বাসা করল। আর একটা গাছ ওরা জবর দখল করে নিল। আমি কাদেরকে বললাম, 'ছেড়ে দেও। করুক ওরা বাসা। দিক ওরা ডিম। এখন ওদের ডিম দেওয়ার সময়-যাবে কোথায়?'

তিনি আরো লিখেছেন-

'এই সমস্ত বাসা ভাঙবার সময় আমি নিজে ধনুক নিয়ে দাঁড়াতাম আর গুলি ছুঁড়তাম। ভয় পেয়ে একটু দূরে যেয়ে চিৎকার করে আরো কিছু সঙ্গী-সাথি যোগাড় করে কাদেরকে আক্রমণ করত। ওদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদকে আমি মনে মনে প্রশংসা করলাম। বাঙালিদের চেয়েও এদের একতা বেশি!

এখন চারটা বাসায় ডিম দিয়েছে। একটা বাসায় বসে থাকে আর একটা পাহারা দেয়। দাঁড়কাক ওদের শত্রু। দুই পক্ষের যুদ্ধও দেখেছি। তুমুল কাণ্ড! ছোট কাকদের সাথে শেষ পর্যন্ত পারে না। দাঁড়কাক যুদ্ধ ভঙ্গ করে পালাইয়া যায়। বাঙালি একতাবদ্ধ হয়ে যদি দাঁড়কাকের মতো শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত তবে নিশ্চয়ই তারাও জয়লাভ করত। তাই কাকের অধ্যবসায়ের কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখে আমারি মনে দুঃখও হয়েছে, কারণ আমার ঘর ভেঙেই তো আমাকে কারাগারে বন্দি করে রেখে দিয়েছে।

কিছুদিন পর্যন্ত কাকরা আমাকে দেখলেই চিৎকার করে প্রতিবাদ করত, ভাবত আমি বুঝি ওদের ঘর ভাঙব। এখন আর আমাকে দেখলে চিৎকার প্রতিবাদ করে না, আর নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে না।' (পৃ: ২১৯-২২০)

দু'টি হলদে পাখি

বঙ্গবন্ধু 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ সূত্রে দু'টি হলদে পাখির প্রসঙ্গ জানা যায়। ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানায় ১৯৫৮ সালে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় দু'টি হলদে পাখির সাথে বঙ্গবন্ধুর সখ্যতা গড়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে তিনি যখন আবার জেলবন্দী হন, তখন সেই পাখি দু'টির খোঁজ করেন। কিন্তু পাখি দু'টি আর আসে না। ১৯৬৬ সালের ১৮ই জুন তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন-

'আজ ৪০ দিন এই কারাগারে আমি আছি কিন্তু হলদে পাখি দু'টি আসল না। ভাবলাম এরা বোধ হয় বেঁচে নাই অথবা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। আর আসবে না। ওদের জন্য আমার খুব দুঃখ হলো। যখন ১৬ মাস এই ঘরটিতে একাকী থাকতাম তখন রোজই সকালবেলা লেখাপড়া বন্ধ করে দৌড়ে যেতাম ওদের দেখার জন্য। মনে হলো ওরা আমার ওপর অভিমান করে চলে গেছে।' (পৃ: ১০১-১০২)

প্রায় ১০ মাস পর বঙ্গবন্ধুর ১৯৬৭ সালের ১১-১৩ই এপ্রিলের ডায়েরিতে কাকতালীয়ভাবে অনুরূপ দু'টি পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু থাকতেন জেলখানার সিভিল ওয়ার্ডে। ওখানে তিনি ফুলের বাগান করতেন। তাঁর ঘরের কাছেই ছিল আম গাছ। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-

'সকাল বেলা যখন ফুলের বাগানে বেড়াতে শুরু করি তখন রাতের কষ্ট ভুলে যাই। গাছতলায় চেয়ার পেতে খবরের কাগজ অথবা বই পড়ি। ভোরের বাতাস আমার মন থেকে সকল দুঃখ মুছে নিয়ে যায়। আমার ঘরটার কাছের আম গাছটিতে রোজ ১০টা-১১টার

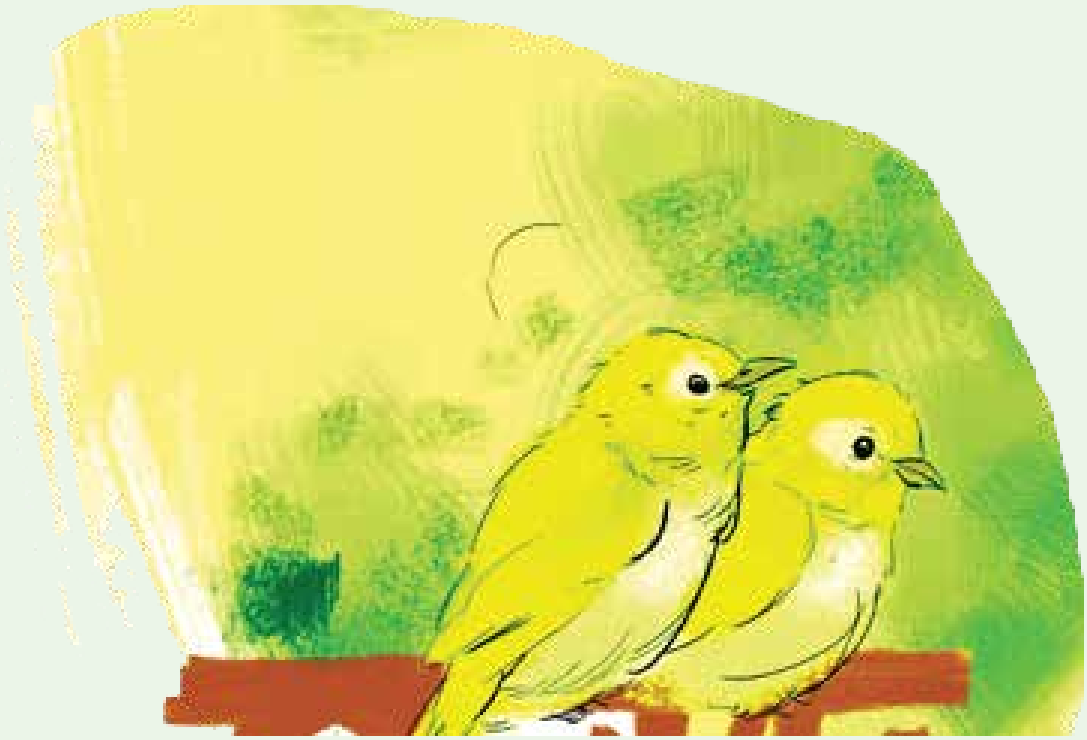

সময় দুইটা হলদে পাখি আসে। ওদের খেলা আমি দেখি। ওদের আমি ভালোবেসে ফেলেছি বলে মনে হয়। ১৯৫৮ সালে দুইটা হলদে পাখি আসত। তাদের চেহারা ও আজও আমার মনে আছে। সেই দুইটা পাখির পরিবর্তে আর দুইটা পাখি আসে। পূর্বের দুইটার চেয়ে একটু ছোট মনে হয়।

১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাখি দুইটা আসত। এবার এসে তাদের কথা আমার মনে আসে, আমি খুঁজতে শুরু করি। এবারও ঠিক একই সময় দু'টা হলদে পাখি এখানে আসত। মনে হয় ওদেরই বংশধর ওরা। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই অথবা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। ১০টা-১১টার মধ্যে ওদের কথা এমনিভাবেই আমার মনে এসে যায়। চক্ষু দুইটা অমনি গাছের ভিতর নিয়া ওদের খুঁজতে থাকি। কয়েকদিন ওদের দেখতে পাই না। রোজই আমি ওদের খুঁজি। তারা কি আমার উপর রাগ করে চলে গেল? আর কি ওদের আমি দেখতে পাব না? বড় ব্যথা পাব ওরা ফিরে না আসলে। পাখি দুইটা যে আমার কত বড় বন্ধু যারা কারাগারে একাকী বন্দি থাকেন নাই তারা বুঝতে পারবেন না। আমাকে তো একেবারে একলা রেখেছে। গাছপালা, হলদে পাখি আর কাকই তো আমার বন্ধু এই নির্জন প্রকোষ্ঠে। (পৃ: ২১৮-২১৯)'।

শেষ কথা

পাখি হলো মুক্তজীবনের প্রতীক। জেলবন্দী জীবনে বঙ্গবন্ধু হলদে পাখি, কবুতর, চড়ুই, কাকদের মধ্যে স্বাধীন ও মুক্ত জীবনের স্বাদ অনুভব করতেন, এদের ভালোবাসতেন। মুক্ত জীবনে তিনি পাখিদের খাবার দিতেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা করতে হলে সবার উচিত বঙ্গবন্ধুর মতো পাখিদের প্রতি সদয় হওয়া। ■

গবেষক

বড়ো দিদি

খায়রুল আলম রাজু

বড়ো কদম গাছটার ডালপালা পুড়ে গেছে। রঞ্জুদের আধপোড়া ঘর। আগুনে পুড়ে মাটির দেয়াল ভেঙে চুরমার। ঘরের জিনিসপাতি জ্বলে ছাই। পুড়ে গেছে রঞ্জুর প্রিয় শিউলি ফুলের গাছটি। আগুনের আঁচে নুইয়ে পড়েছে উঠোনের তুলসী গাছটা। পুড়ে গেছে পাড়ার সবকটি ঘর। সেন পাড়ার আলি, রায় পাড়ার দীপু, মীর্জা পাড়ার রীতাদের বাড়িও পুড়ে ছাই। রঞ্জু উপরে তাকিয়ে দেখল, তাদের আমগাছটার সব বোল ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। সারারাত না ঘুমিয়ে জেগেছিল রঞ্জু। গতকাল সন্ধ্যায় মিলিটারিরা আগুন লাগিয়েছিল। জীবন বাচাঁতে বড়দি'কে নিয়ে গ্রামের সবার সাথে তারা জঙ্গলে রাত কাটিয়েছে। শহরের দিক দিয়ে আসলে সবার শেষে রঞ্জুদের গ্রাম। গ্রামের পরে সবুজ জঙ্গল। তারপরে ঢেউতোলা ছোট্ট নদী। মধুমতী। নদী পেরুলে বিশাল মাঠ। সেই মাঠের শেষে কাঁটাতারের বেড়া। এটা বাংলাদেশ আর ভারতের সীমান্ত। রঞ্জু। রঞ্জু। এই রঞ্জু...

বড়দি'র ডাকে আমগাছ থেকে চোখ নামিয়ে ঘাড় ফিরে রঞ্জু বড়দি'র দিকে চাইল। বড়দি'র আজ মন খারাপ। মুখে হাসি নেই।

কান্না ভেজা চোখ। অথচ বাবা আর ছোটদি মরার সময় বড়দি ছিল পাথরের মতো শক্ত। গত বছর ডায়রিয়ায় রঞ্জুর ছোটো দিদি আর বাবা মারা যান। সেন পাড়ার বড়ো কবিরাজের ওষুধ সেই রোগ সারাতে পারেনি। মাকেও কোনোদিন রঞ্জু দেখেনি। অবনির মা বলেছেন, 'রঞ্জুর জন্মের সময় নাকি তার মা মারা গেছেন। সেই থেকে বড়ো দিদি রঞ্জুকে কোলেপিঠে বড়ো করেছেন। সর্দার বাড়িতে কাজ করে বড়ো দিদি যা পেত, তাতেই রঞ্জুদের দিন কোনো রকম চলে যেত।

আজ গ্রীষ্মের দুপুর। খুব গরম পড়েছে।

বড়ো দিদি নিচু গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি আয় রঞ্জু, সন্ধ্যার আগে আগে পৌছাতে হবে। জলদি আয়

রঞ্জু তবুও বড়ো আমগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকওদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিল সে। দিদিকে দশ বছরের রঞ্জু কঠিন এক প্রশ্ন করল, 'আমরা কই যাব রে দিদি, মামা বাড়ি?'

রঞ্জুর কথায় তার বড়'দি কিছুই বলল না। কিছুক্ষণ পর থেমে থেমে বড়'দি বলল, 'আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাব রে। অনেক দূরে। '

কেন দিদি? আমাদের ঘর পুড়ে গেছে বলে নতুন দেশে যাব, তাই না?'

'না। দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সবাই দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। আমরাও যাব।' নইলে মিলিটারিদের বন্দুকের গুলিতে মরতে হবে। কথাটি শুনে রঞ্জুর মন কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। আগে রঞ্জুর সারাদিন কাটত আলি, দীপু আর রীতার সাথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে। নদীতে দলবেধে সাঁতরে। পাখির বাসা খুঁজে। তারা ছিল রঞ্জুর বন্ধু। সবাই মীর্জা পাড়ার বড়ো ইশকুলে পড়ত। দিদিকে রঞ্জু কান্নামাখা কণ্ঠে বলল, 'দিদি, যুদ্ধ মানে কি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া, আগুনে ঘরপোড়া, না খেয়ে থাকা'...

রঞ্জুর কথায় তার বড়ো দিদি চুপ করে রইল।

রঞ্জু বড়ো একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বড়দি, যুদ্ধ মানে কী আমাদের একা যেতে হবে? আর কেউ যাবে না?

যাবে রে, যাবে। দেখিস না সকাল থেকে কত লোক নদী পেরিয়ে দক্ষিণের দিকে যাচ্ছে। সবাই ভারত যাবে।' 'তারা কি আর আসবে না, দিদি?'

'জানি না

রঞ্জু উদগ্রীব হয়ে বলল, 'বড়দি, আমাদের সাথে কে কে যাবে?' সেন পাড়ার বড়ো বাবুরা, রায়ের পাড়ার পূজা দিদিরা, মীর্জা পাড়ার কালি ঠাকুর সহ হরি কাকা বাদে সবাই যাবে।'

রঞ্জু চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'হরি কাকা কেন যাবেন না? উনি মন্দিরের পুরোহিত বলে উনার জন্য যুদ্ধ আসেনি তাই না বড়দি?'

বড় দিদি চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'নারে বোকা। হরি কাকু দেশের মায়া ছেড়ে যাবেন না। মরতে হলে দেশের মাটিতেই তিনি মরবেন।' রঞ্জু বন্ধুদের থেকে বিদায় নেবার সময়টুকুও পায়নি। আলিকে তার গল্পের বইটিও ফেরত দিতে পারেনি রঞ্জু। বইটিও আগুনে পুড়ে গেছে। দীপুর কাছে গেলে সে হয়ত ভাবত, রঞ্জু তার কাছে শুধু বিদায় নিতে নয় পাওনা দুই টাকাও নিতে এসেছে। একা আর রীতার কাছেও বিদায় নিতে যায়নি রঞ্জু। এতে তারা দুজন শুনলে কষ্ট পাবে। সন্ধ্যার সাথে সাথেই তারা ভারত সীমান্তে পৌঁছে গেল। সারাপথ বড়দি'কে কাঁদতে দেখে রঞ্জু বলল, 'দিদি, যুদ্ধ শেষে আমরা ফিরে আসব। তুই কাঁদিস না।' রঞ্জুরও খুব কান্না পেয়েছিল। একটু পর পর সে পিছন ফিরে দেখছিল। একটা সময় তাদের সবুজ গ্রামের শেষ বিন্দুটি মিলিয়ে গেল। রঞ্জুরা তখন ভারতের সীমানায় চলে এসেছে। বড়ো আমগাছটির কথা রঞ্জুর বার বার মনে পড়ছে। হরি কাকুকে রঞ্জু বলেছিল, এই বছর মন্দিরে সে চার হালি বড়ো বড়ো আম দান করবে। ভাবতেই রঞ্জুর খুব কান্না আসল। বর্ষায় কদম গাছটার সুন্দর বলের মতো গোল ফুলগুলো আর সে দেখবে না। বড়দি'কে বলে রঞ্জুর আবার গ্রামে ফিরে চেতে মন চাইছিল। দিদিও হয়ত গ্রামের জন্যই কাঁদছে। সকালে সত্যি সত্যি একদল মুক্তিসেনাদের সাথে নিজেদের গ্রামে ফিরে রঞ্জুরা। মধুমতী নদীর ওপাড়ের সুরতি জঙ্গলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তারা থাকবে। রঞ্জু সারাদিন ঘুরে ঘুরে মিলিটারিদের নানান তথ্য সংগ্রহ করে। আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল-ডাল যা পায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিয়ে আসে। বড়ো দিদি করে রান্নার কাজ।

আজ আকাশে ভরা জোছনা। রঞ্জু বড়দি'র পাশে শুইয়ে শুইয়ে ভাবে, ৯ মাস পর বড়দি'র আঠারো বছর হবে। হরি কাকা মরার দুইদিন আগে রঞ্জুকে বলেছেন, দেশ স্বাধীন হলে তার বড়দি উপমার বিয়ে হবে। তখন রঞ্জুর সব বন্ধুরা ফিরে আসবে। কাউকে আর জঙ্গলে থাকতে হবে না। সবার ভিটায় নতুন ঘর উঠবে। মুক্ত স্বাধীন পাখির মতো সবাই ঘুরবে। স্বাধীনতার এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে রঞ্জু বড়দির কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে রঞ্জু পুঁইশাকের গুঁটি চিপে লাল রং বের করল। রং দিয়ে সে দেশের পতাকা বানাবে। একটি কচি সবুজ কলাপাতার মাঝখানে গোলাকার বৃত্ত আঁকল। বৃত্তটিতে লাল রং মাখিয়ে দিল। বাহ! কী সুন্দর পতাকা দেশের পতাকা। লাল-সবুজের পতাকা। সেই পতাকা বাঁশে বেঁধে নদীর পাড়ে পুতে আসে রঞ্জু। মনে মনে ভাবে, ' দেশ স্বাধীন হলে কলাপাতার পতাকা হাতে এদিকওদিক, পাড়ায় পাড়ায় সে দৌড়াবে। আর গলা ছেড়ে চিৎকার করে বলবে 'জয় বাংলা'... ■

গল্পকার

বিদেশি বন্ধু পরম বন্ধু

বিনয় দত্ত

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের রণাঙ্গনের যোদ্ধারা অবদান রেখেছেন সম্মুখ যুদ্ধ করে। কারণ আমাদের একটি স্বাধীন দেশ প্রয়োজন। কিন্তু যে মানুষগুলো আমাদের দেশের নয়, তারাও যে এই দেশের স্বাধীনতার জন্য অবদান রেখেছেন তারা কীসের তাগিদ অনুভব করেছেন?

এই দেশের প্রতি শোষণ-বঞ্চনা বন্ধের তাগিদে, কখনো নিপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে, কখনো বাংলাদেশকে ভালোবেসে বা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধ করেছেন বিদেশি বন্ধুরা। তাদের অবদান ভুলবার মতো নয়। তারা আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের মিত্র। তাদের শক্তি আমাদের রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের আরো বলশালী করে তুলেছিল।

এই রকম একজন মিত্র বা পরম বন্ধু হলেন ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড। তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। ১৯৭১ সালে ওডারল্যান্ড বাটা শু কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হয়ে বাংলাদেশে যোগ দিয়েছেন। তার কার্যালয় ছিল টঙ্গিতে। দেশের উত্তাল পরিস্থিতি দেখে তিনি আঁচ করতে পেরেছেন সবকিছু। তাই তিনি নিজ উদ্যোগে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হিসেবে যুদ্ধের সময় অবাধে চলাচলের সুযোগ কাজে লাগান।

বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পাকিস্তানিদের গণহত্যা আর নির্যাতনের ছবি তুলে তা গোপনে বিদেশি গণমাধ্যমে পাঠাতেন। ওডারল্যান্ড নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন কর্নেল এম এ জি ওসমানীর সঙ্গেও। তিনি অনুভব করলেন তার আরো বেশি কিছু করা জরুরি। তাই তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কমান্ডো ট্রেনিংয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন। টঙ্গির বাটা কারখানার ভেতরে

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদের নগদ অর্থ, খাদ্য ও কাপড়চোপড় দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করতে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি নিজেও বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা যুদ্ধ চালান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর প্রতীক' সম্মান প্রদান করা হয়। তিনিই একমাত্র বিদেশি, যাকে বাংলাদেশ সরকার এই খেতাবে ভূষিত করেছে। এই নির্ভীক যোদ্ধা এবং পরম বন্ধুর ঋণ এই দেশ কখনো শোধ করতে পারবে না।

পুরো মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন, পুরো সময় জুড়ে বিপন্ন বাঙালিদের অভিভাবক হিসেবে থেকেছেন ১ কোটি শরণার্থী তাঁর দেশে আশ্রয় দিয়েছেন শুধু আশ্রয়ই নয়, তাদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সাহায্যও করেন এমনকি বীরের জাতি বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেয়ারও সু-ব্যবস্থা করেছেন একজন অভিভাবক কেমন হতে পারেন তা ইন্দিরা গান্ধীকে না দেখলে, তাঁর অবদানের কথা না জানলে বিশ্বাস করা যাবে না। ইন্দিরা গান্ধী একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দেয়ার জন্য যা যা করণীয় সবই করেছেন। বাংলাদেশকে জন্ম দেয়ার পেছনে তিনি এই জাতির জননীর ভূমিকা রেখেছেন।

একজন দিলেন আশ্রয় আরেকজন লিখলেন অসাধারণ দুটি গান। বলছিলাম একাত্তরের অনুপ্রেরণা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় দারুণ দুটি গান রচনা করেছেন। সেই দুটি গানের একটি 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে/ লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি/ আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি/ বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ'। অন্যটি 'মা গো ভাবনা কেন/ আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে/ তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি/তোমার ভয় নেই মা আমরা/প্রতিবাদ করতে জানি।'

এই দুটি গান অন্যান্য গানের সাথে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয়টি মুক্তিযোদ্ধাদের অণুপ্রেরণা দিয়েছ এই একটি গানে বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে পাওয়া যায় আর কোনো গানে তাঁকে সেভাবে পাওয়া যায় না। আসলেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মহান গীতিকবি। মজার ব্যাপার হলো, দেশ স্বাধীনের এত বছর পরেও এই গান দুটির আবেদন এখনো সজীব।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। আমার বাড়ি ছিল পাবনায়। ১৯৪৭ সালে ভারতে চলে আসি। কিন্তু 'আমার মন পড়ে ছিল বাংলাদেশে। তাই গান দুটি লিখে সেই জন্মস্থানের ঋণ কিছুটা হলেও আমি শোধ করেছি।'

আহা মাতৃভূমির প্রতি কী অগাধ ভালোবাসা। এইরকম ভালোবাসা আছে বলেই তিনি অসাধারণ দুটি গান রচনা করতে পেরেছেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন মিত্র হলেন এডওয়ার্ড কেনেডি। তিনি ছিলেন মার্কিন সিনেটর। পাকিস্তানি বাহিনীর গণ-হত্যাযজ্ঞের খবর তখনো ছড়ায়নি। ঢাকা থেকে মার্কিন কনসাল আর্চার ব্লাডের গোপন রিপোর্ট পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন এডওয়ার্ড কেনেডি।

তিনি ১লা এপ্রিল ১৯৭১ মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশ-সংক্রান্ত তাঁর প্রথম বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, 'মাননীয় সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ঘটনার বিপুল জটিলতা আমি অনুধাবন করি। কূটনীতিক ও মানবতাবাদীদের জন্য এ এক জটিল বিষয়। তবে আমাদের সরকার কি এই হত্যাযজ্ঞের নিন্দা করবে না? সংঘাতের শিকার হওয়া লাখো মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বনা নিয়ে আমরা কি ভাবিত হব না? আমরা কি সহিংসতা রোধে আমাদের উত্তম সেবা দিতে চাইব না, অন্তত তেমন প্রচেষ্টা যাঁরা নেবে তাঁদের সহায়তা করব না?'

শুধু তাই নয়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য মার্কিন সিনেটর উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থক হলেন

এই এডওয়ার্ড কেনেডি। কেনেডি ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে এসেছেন সপরিবারে। ঘুরে দেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের দক্ষিণ দিকে যে বটগাছ আছে সেটি লাগিয়েছিলেন তিনি ১৯৭২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সেই জায়গায় গিয়ে সিক্ত হন উষ্ণতায়। তাঁর সন্তানেরাও তাদের বাবার কর্মকাণ্ডে গর্বিত।

একাত্তরে এইরকম পরম বন্ধুদের অবদান যে কত তা বলে শেষ করা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন পাকিস্তানিরা আমাদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার আর গণহত্যা চালাচ্ছিল সেই সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই গণহত্যা ঘুরে ঘুরে দেখেছেন সাংবাদিক সাইমন ড্রিং। যিনি একাত্তরের পরম বন্ধু। ১৯৭১ সালে সাইমন ছিলেন লন্ডনের দৈনিক দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ' এর রিপোর্টার। লন্ডনের সদর দপ্তর থেকে ফোন করে তাকে বলা হলো, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সেখানে বড়ো কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তুমি ঢাকা যাও।'

সাইমন ঢাকায় আসলেন। ঢাকার পরিস্থিতি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। ২৫শে মার্চ গণহত্যার সময় সকল বিদেশি সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সাইমনও তাদের মধ্যে ছিল। ২৭শে মার্চ সকালে তিনি হোটেলের কর্মচারীদের সহযোগিতায় ছোট্ট একটি মোটরভ্যানে করে ঘুরে ঘুরে দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকা। ঘুরে দেখা সেই দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাই লিখে ফেলেন ভয়ানক এক প্রতিবেদন।

'ট্যাংকস ক্র্যাশ রিভোল্ট ইন পাকিস্তান' শিরোনামের বিখ্যাত সেই প্রতিবেদন লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ৩০শে মার্চ ১৯৭১-এ ছাপা হয়। মূলত এই প্রতিবেদনের পরই সারা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে পাকিস্তানিরা এই দেশের নিরপরাধ মানুষের উপর কীভাবে অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়েছে।

শুধু লেখা নয় গানেও সমৃদ্ধ হয়েছি আমরা। জর্জ হ্যারিসন আর পণ্ডিত রবিশঙ্করের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু খানিকটা অজানা থেকে যায় জোয়ান বায়েজের কথা। জোয়ান বায়েজ একাত্তরের অকৃত্রিম বন্ধু। আমেরিকান লোকশিল্পী, গীতিকার ও সামাজিক কর্মী। তিনি তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ দেখেননি, শুধু শুনেছেন বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান)-এর কথা, শুনেছেন এই দেশের মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে, হত্যা করছে পাকিস্তানিরা। এই বার্তা জোয়ান বায়েজের কাছে ছিল। সেই বার্তা জোয়ানের কথায় হয়ে উঠে অনন্য সাধারণ গান।

আমার মতে, মুক্তিযুদ্ধের উপর যতগুলো গান বা কবিতা রচিত হয়েছে তার মধ্যে এই গানটির আবেদন সবচেয়ে বেশি। যখনই তার 'সং অব বাংলাদেশ' গানটি শুনি, তখনই মনে হয় কতটা দরদ দিয়ে, কতটা অনুভূতি দিয়ে তিনি একটি অচেনা, অজানা দেশের জন্য গেয়ে উঠেছেন, 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ/ বাংলাদেশ বাংলাদেশ/অস্তাচলে যেখানে দিন শেষ, /লাখো প্রাণের রক্তে রাঙা দেশ।'

একটা দেশের জন্য কতটা ভালোবাসা থাকলে এইভাবে গান গাওয়া যায় তা আমার জানা নেই, তবে আমি জানি এই মহান শিল্পী আমাদের বন্ধু, আমাদের মিত্র।

এইরকম অসংখ্য অকৃত্রিম বন্ধুদের আমরা সম্মানিত করতে পেরেছি এইটা আমাদের জন্য গৌরবের, আনন্দের। ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ২১ দেশের ৩৩৮ জন বিদেশি ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনকে সম্মাননা জানায় বর্তমান সরকার। 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা', বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা ও মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা এই তিন শ্রেণিতে সম্মাননা দেওয়া হয়। স্বাধীনতার এত বছর পরে তাদের সম্মানিত করতে পেরে নিজেদের কেমন যেন স্বস্তি লাগছে। তা আনন্দের, গৌরবের, গর্বের। ■

গবেষক

কিশোর জয়নালের মুক্তিযুদ্ধ

জুয়েল আশরাফ

পনেরো বছর বয়সি জয়নালের মায়ের প্রচণ্ড জ্বর। বাবা বাড়িতে নেই, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গেছেন। একটি ছোটো বোন আছে। ছোট্ট সংসারের পুরো দায়িত্ব এখন কিশোর জয়নালের কাঁধে। তার চারটি ছাগল ও তিনটি গরু আছে। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে সে গবাদি পশু নিয়ে উঁচু পাহাড় আর সমতল ভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে যায়।

জয়নালের বাবা মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পর থেকেই গ্রাম থেকে তারা বের হয়ে গেছে। গ্রামের লোকজন বলেছে মিলিটারি এসে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িই শুধু পুড়িয়ে ছারখার করবে না, আশপাশের বাড়িগুলোতেও আগুন ধরিয়ে দেবে। গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার কারণেই জয়নাল অসুস্থ মা আর ছোটো বোনকে নিয়ে চলে গেল জঙ্গলের কাছে। সঙ্গে নিয়ে গেল গবাদিপশু।

মায়ের প্রচণ্ড জ্বর। এমতাবস্থায় তাকে বের করে আনা জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে কম না। জঙ্গলে থেকেও মিলিটারির কাছে ধরা পড়ার আশঙ্কা। কিশোর জয়নাল বোঝে, মিলিটারির পক্ষে যেসব বাঙালি রাজাকার রয়েছে তারা বলে দেবে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র, গবাদি পশু এবং পরিবারের কথা।

জয়নালকে চিন্তিত দেখে মা বললেন, চিন্তা করিস না, আমি বাড়িতেই থাকব। মিলিটারি আমার কোনো ক্ষতি করবে না।

জয়নাল আঁতকে উঠে বলল, না মা, আমি তোমার জীবনকে বিপদে ফেলতে পারব না। তোমার জ্বর

কমলেই আমরা জঙ্গলের কাছে চলে যাব। সেখানে ছাউনি তুলব। আমি আর সেই ছোটো শিশু নই যে শেয়ালের ভয় পাব। আমি এখানে জঙ্গলের প্রতিটি রাস্তা জানি। গরু ছাগলের জন্য জঙ্গলে ঘাস– পানির ব্যবস্থা করে নেবো।

কিন্তু শোন জয়নাল, তুই একা কেমনে...!

কিন্তু কিছুই না, মা! আমি বললাম না।

এই বলে জয়নাল গরু নিয়ে চলে গেল। তাকে দেখে গ্রামের কিছু লোক সহানুভূতির সঙ্গে বলে উঠল, তোমার মায়ের জ্বর কমেছে?

না কাকা, মা ভালো নেই। দুই-একদিন পর হয়ত জ্বর নামবে।

কিন্তু আজ চারদিন হয়ে গেল। জয়নালের মায়ের জ্বর কখনো নেমে আসে আবার কখনো বাড়ে, এদিকে মিলিটারি আতঙ্কও বেড়ে যায়।

আজ গবাদি পশুকেও বাইরে নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। জয়নাল একা একা ঘুরে বেড়ায় গহিন জঙ্গলে। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে একদিন জঙ্গলের ভেতর জুতার চিহ্ন দেখতে পেল। জয়নাল বুঝতে পারল, এত গভীর জঙ্গলে কে আসতে পারে। আর চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে মিলিটারি জুতা। সে মনে মনে ভাবল, মিলিটারি ক্যাম্প এখান থেকে অনেক দূরে। সে কিছুই বুঝতে পারল না। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছাউনি ঘরের দিকে দৌড়ে এসে মাকে সব খুলে বলল। কথাটা শুনে মায়ের মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

জয়নাল বলল, মা, একথা শুনে মন খারাপ কেন? আমাকে বলো!

মা বললেন, ভালো লাগছে না! আমি অস্থির বোধ করছি। আর কিছু না।

জয়নাল খেয়ে শুয়ে পড়ল কিন্তু ঘুম তার চোখের অনেক দূরে। তার ভাবনা হচ্ছে, এই জুতা এখানে কীভাবে এসেছে! জয়নাল ঘুরে দেখল, তার মা ও বোন ঘুমাচ্ছে। সে উঠে গ্রামের গণি চাচাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের দিকে গেল। যেখানে সে জুতা দেখেছে। দূর থেকে কিছু মানুষের গলা শুনতে পেল। কে হতে পারে আর রাতের আঁধারে তারা এখানে কী করছে!

জয়নাল খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। লুকিয়ে লুকিয়ে তারা সেই জায়গায় পৌঁছে গেল যেখান থেকে আওয়াজ আসছে। একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগল। কিছু লোক তার ছাগলটি ধরে রেখেছে। তাদের কাছে প্রচুর অস্ত্র। জয়নাল মনোযোগ দিয়ে দেখল, তাদের পোশাক মিলিটারি পোশাকের মতো। সে জিজ্ঞেস করল, চাচা এই মানুষগুলো কারা?

গণি চাচা বললেন, বোধহয় ডাকাত দল।

প্রায়ই জয়নাল মুক্তিবাহিনীদের কাছ থেকে শুনেছে যে, পাকিস্তানি মিলিটারিরা বহুবার নদী সাঁতরিয়ে জঙ্গলে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে।

জয়নাল বলল, কিন্তু চাচা, আমি এখানে কোনো ডাকাত দল দেখিনি! মিলিটারি দেখছি।

গণি চাচা বললেন, আরে বোকাদের সাহস নেই এত গাঙ সাঁতরিয়ে আমাদের গ্রামে আসবে।

কিন্তু আজ মিলিটারি ইতিমধ্যেই এখানে এসেছে। জয়নাল ভালো করে তাকালো, মিলিটারি সংখ্যায় অনেক। জয়নাল ভাবল, ওহ আল্লাহ! তাদের সংখ্যা অনেক। জানি না, আমাদের মুক্তিবাহিনী তা জানবে কি না! আমাকে কিছু করতে হবে। হ্যাঁ আমি করব।

জয়নাল গণি চাচাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার মায়ের কাছে গিয়ে সব খুলে বলল, মা, ওদের পরিকল্পনা আমার ভালো লাগে না। আমাকে কিছু করতে হবে, না হলে!

কি করবি ভাবছিস!

হ্যাঁ, আমি মুক্তিবাহিনীর খোঁজে যাব। তাদের সব খবর দেবো।

মা চিন্তিত মুখে বললেন, তুই যদি কোথাও ধরা পড়িস বা যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলিস!

মা, আমি এই জায়গার প্রতিটি কোনা চিনি। তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন আমার মহৎ উদ্দেশ্য সফল করে। আমি শত্রুদের ভুল পরিকল্পনায় ছাই দিতে পারি।

মা দুই হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ, আমার ছেলেটিও তার বাবার মতো মুক্তিবাহিনী হতে চাচ্ছে। এর প্রতি তোমার দয়া রাখো। জয়নাল, আল্লাহ তোকে তোর মহৎ উদ্দেশ্য সফল করুক। আমীন!

মায়ের দোয়া দেখে জয়নাল দ্রুত অন্ধকার ভেদ করে ক্ষেতের আইলের দিকে চলে গেল। মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প খুব কম। বেশিরভাগ লোক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ

নিতে গেছে। প্রায় দুই ঘণ্টা হাঁটার পর অবশেষে জয়নাল মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে পেল। সে জঙ্গলের ভেতর যা দেখেছে সব খবর উপস্থিত মুক্তিবাহিনীদের দিয়ে দিল।

একথা শুনে সবাই হতবাক। একটি ছোট্ট ছেলে এতদূর এসে তাদের খবর দিয়েছে। মিলিটারি পুরো গ্রামকে দখল করতে চলে এসেছে। দ্রুত সব মুক্তিবাহিনী তাদের অস্ত্র নিয়ে জয়নালের সাথে চলে গেল। তারা যেতেই জয়নাল কমান্ডারকে বলল, আপনারা যেই রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন সেটি অনেক লম্বা রাস্তা। সেখানে পৌঁছাতে আপনাদের সকাল হবে। আমি আপনাদের ছোটো রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব।

মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জয়নালকে অনুসরণ করলেন। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই মিলিটারি শত্রুদের সামনে দেখতে পেলেন।

মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জয়নালকে বললেন, ছেলে, এখন আমরা সামনের দিকে আক্রমণ করব। সামনে বিপদ আছে। এখন তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও।

জয়নাল বলল, না, আমাকে আপনাদের সাথে থাকতে দিন। আমি এলাকাটা খুব ভালো করেই জানি। আমি আপনাদের মতো সাহসী না, আমি অস্ত্র ব্যবহার করতেও জানি না, কিন্তু আমি আপনাদেরকে অস্ত্র তুলে ধরতে সাহায্য করতে পারি। আমি আপনাদের সাথে আছি। আমি থাকব।

অনেক বলার পরও মায়ের কাছে ফিরে গেল না জয়নাল। মুক্তিবাহিনী গোলাবর্ষণ শুরু করে। হঠাৎ মুক্তিবাহিনীকে সামনে দেখে শত্রুদের হুঁশ উড়ে গেল। মিলিটারিরা স্বপ্নেও ভাবেনি যে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের এত গভীর জঙ্গলে থাকার খবর পাবে।

মুক্তিবাহিনীর ছোটো দলটি পূর্ণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করল। শত্রুদের পরাজিত করতে সক্ষম হলো। এই যুদ্ধে মিলিটারি দলের নেতা ও দুই জন মুক্তিবাহিনী ছাড়া বাকি সবাই শহিদ হয়। ছোট্ট সৈনিক জয়নালের বুকের বাম দিকে একটি গুলি এসে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের জামা লাল হয়ে উঠে। নিজের জীবনের পরোয়া না করে, দেশের মানুষের সুরক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করল কিশোর জয়নাল। ■

শিশু সাহিত্যিক

পতাকা

সাবরিনা ইসলাম

বিজয়ের লাল-সবুজ পতাকা
উড়ছে পতপত করে
সেই পতাকা দেখে আমার
গর্বে বুকটা যায় ভরে।

ডিসেম্বর মাস এলেই
মনে পড়ে সে সব বীরদের কথা
যাদের জন্য হয়েছে মোদের
বিজয়ের মালা গাঁথা।

৭ম শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস
স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বিজয়

ইরফান আহমেদ

বাংলাদেশ নামটি এখন
সবার কাছে চেনা
নয়মাস যুদ্ধ করে
হয়েছে বিজয় ছিনিয়ে আনা।

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় নিয়ে
দামাল ছেলে ফিরে আপন ঘরে
গর্বিত মায়ের দু'চোখে
আনন্দ অশ্রু ঝরে।

৭ম শ্রেণি, সাভার ব্যাংক
কলোনি স্কুল

আমার দেশ আমার মা

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

মায়ের মতো দেশটি আমার, মায়ের মতো ছবি
এই দেশেতে জনম নিয়ে ধন্য জীবন লভি।
মাঠ-প্রান্তর বন-বনানী পাহাড়-টিলা আছে
ষড়ঋতুর মায়ার ছায়ায় মৌসুমী ফল গাছে।

নদীর বুকে পালের নাও জোয়ার ভাটা ধায়
সাগর জলের ঢেউ টলমল শান্ত-সবুজ বায়।
আকাশ পাড়ের মেঘমেঘালির বিষ্টি যখন পড়ে
ধান-পাটেরা দোলায় মাথা পদ্মপুকুর ভরে।

পৌষ পাবনে এই দেশেতে পিঠে খাওয়ার ধুম
জোছনা রাতে যাত্রা পালা নেয় কেড়ে নেয় ঘুম।
এই দেশেরই হাজার কবি দেশের কথা লেখে-
মায়ের ভাষায় আদর-সোহাগ হাজার ছবি দেখে।

বিজয় এল

মো. পারভেজ হোসাইন

মন ভরে যায় দেশটি দেখে
যখন নয়ন খুলি-
মায়ের মতো মাতৃভূমি
কেমন করে ভুলি।

বিজয় দিনে হৃদয় মাঝে
জাগে হাজার স্মৃতি
মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ভাইদের
জানাই শ্রদ্ধা প্রীতি।

ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ
বিজয় দিবস আসে–
জাতির পিতার শত স্মৃতি
চোখের পাতায় ভাসে।

বিজয় এল বিজয় এল
মুখে সবার হাসি–
স্বাধীন স্বদেশ মাতৃভূমি
আমরা ভালোবাসি।

বিজয়ের স্বাদ

ফরিদ সাইদ

যুদ্ধে যাবার
ডাক এসেছে
হাঁক এসেছে
মন কি ঘরে রয়?

ভাই মরেছে
বোন মরেছে
দুঃখ কি আর সয়?

প্রাণের মায়া ছিন্ন করে
এগিয়ে গেল যারা
প্রতিরোধের দেয়াল দিয়ে
আনল বিজয় তারা!

নীল আকাশে
পাখির হাসি
ফুলবাগানে
ফুলের হাসি!

সবুজ-শ্যামল বাংলা আমার
দাঁড়ায় মাথা তুলে
বহু মানুষ রক্ত দিলো-
কী করে যাই ভুলে?

বিজয়ের স্বাদ যে পেয়েছে
সে-ই তো দেশের লোক
উড়িয়ে দিলাম
ওই পতাকা
হোক না যতই শোক!

ডিসেম্বরের ষোলো

ইশরাত আরা দ্যুতি

ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ
কেমন কেমন লাগে
দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ
ভালোবাসা জাগে।

ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ
ভাই হারানোর দুঃখ
ছেলে হারা শত মায়ের
দুঃখে মলিন মুখ।

ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ
মুক্ত স্বাধীন পাখি
আনন্দেতে আপন নীড়ে
করে ডাকাডাকি।

ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ
আগুনঝরা দিন
বুকের মাঝে বেজে ওঠে
আনন্দেরই বীণা।

রক্তে ঝরা বাংলা

বাবুল তালুকদার

বিজয়ের আলো জ্বলছে ঘরে
বাঙালি মানুষ মুক্ত
বাংলা আমার লাল-সবুজের
স্বাধীন বাংলায় যুক্ত।

মুক্তিযুদ্ধের দেশ যে আমার
রক্ত ঝরে পাই
শহিদ যোদ্ধা প্রাণ দিলো
জয়েরই গান গাই।

গর্ব আমার মা ও মাটির
গর্ব আমার যোদ্ধা
সবে মিলে স্মরণ করি
আমরা জানাই শ্রদ্ধা।

দেশটা আমার স্বাধীন হলো
জাতির পিতার জন্য
বিশ্ববাসী গর্ব করে
বাঙালি জানায় ধন্য।

সাহসী ছেলে সোহাগ

জসীম আল ফাহিম

মেঘলা আকাশ। সকালে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হয়ে গেছে। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হলে আসলে আকাশ পরিষ্কার হয় না। আকাশ নির্মল হওয়ার জন্য দরকার ভারী বৃষ্টিপাত। রাতের দিকে ভারী বৃষ্টিপাতের আশা করা যায়।

তখন দুপুরবেলা। অনেকদিন ধরে আমার এলএমজিটা পরিষ্কার করব ভাবছিলাম। অবসর হয় না বলে পরিষ্কার করাও হয়ে ওঠেনি। আমাদের ক্যাম্পের সামনে একটু খোলা জায়গা। খোলা জায়গায় বসে আমি এলএমজিটা পরিষ্কার করছিলাম।

এমন সময় মুক্তিযোদ্ধা রহিম এসে বলল, 'জালাল ভাই। তুমি তো সব জানোই। অপারেশন করে আমরা কেমন একগুঁয়ে হয়ে পড়েছি। তাই আমাদের একটু বিশ্রাম দাও। বিশ্রাম নিলে শরীরে কর্মক্ষমতা বাড়ে। মনেও কাজের উদ্যমতা জাগে। দলের কমান্ডার তুমি। তুমি চাইলেই সব হবে।'

আমি ভেবে দেখলাম, 'রহিমের কথায় যুক্তি আছে। মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের একটা দিন বিশ্রামে থাকা দরকার।'

সেদিন ছিল আমাদের বিশ্রামের দিন। মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা যে যার মতো একটা দিন বিশ্রাম করছেন।

আর আমি এলএমজিটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি।

সে সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম দূরে ছোটো একটা ছেলে আমাদের ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে। ছেলেটিকে দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগল–কে এই ছেলে? ক্যাম্পের দিকেই বা আসছে কেন? কী চায় সে আমাদের কাছে!

ছেলেটি ক্যাম্প থেকে কিছুদূর থাকতেই আমি তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম। ছেলেটিও থামল। তারপর সে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিলো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ছেলেটি বলতে লাগল, 'দুনিয়াতে আমার কেউ আর বেঁচে নেই চাচাজান। মিলিটারিরা আমার মা-বাবা আর বড়ো ভাইকে আজ সকালে মেরে ফেলেছে। আমার বড়ো বোনকে তারা গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় রাজাকাররা সারা গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে।'

এই বলে ছেলেটি হাউমাউ করে ওঠল।

ছেলেটির এমন কান্না দেখে আমার খুব মায়া হলো। আমি তাকে কাছে ডেকে নিলাম। বয়স ওর বেশি নয়। দশ কী এগারো বছর হবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কীরে তোর?'

ছেলেটি কান্না থামিয়ে বলল, 'আমার নাম সোহাগ। মা-বাবা বড়ো আদর করে নামটা রেখেছিলেন। বলতে পারেন চাচাজান, আমি এখন কাকে মা বলে ডাকব? কাকে বাবা বলে ডাকব?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সোহাগ তোর বাবার নাম কী?'

সোহাগ বলল, 'আবদুল গফুর।'

'আবদুল গফুর' নামটা শোনামাত্র তাদের গ্রামের নাম জানার জন্য আমার বড়ো ইচ্ছে হলো। পরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোদের গ্রামের নাম কী?'

সোহাগ বলল, 'গ্রামের নাম কৃষ্ণপুর।'

কৃষ্ণপুরের আবদুল গফুর তো আমার বন্ধু। আমরা একসাথে স্কুলে পড়েছি। আমি বুঝলাম–কৃষ্ণপুরে আজ মিলিটারিরা অভিযান চালিয়ে আমার বন্ধু গফুরের পরিবারকে হত্যা করেছে। গফুরের মৃত্যুটা আমাকে খুব পীড়া দিতে লাগল। কারণ চলতি সপ্তাহেই গফুর তার বড়ো ছেলেকে নিয়ে আমাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার কথা। পরে আমি সোহাগের মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'মা-বাবা কারও চিরদিন বেঁচে থাকে না-রে বাবা। তোর মা-বাবা আর ভাই দেশের জন্য শহিদ হয়েছেন। তাদের জন্য আল্লাহপাকের কাছে তুই দোয়া কর। তোর দোয়া আল্লাহপাক কবুল করবেন। আর তোর বোনটিকে উদ্ধার করার জন্য আজ রাতেই আমরা মিলিটারি ক্যাম্পে গিয়ে অভিযান চালাবো।'

পরে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য করে আমি বললাম, 'মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা শোনো। আজ আমরা আর বিশ্রাম নেব না। আজ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে যাব। কৃষ্ণপুর হাই স্কুলে মিলিটারিরা ক্যাম্প বসিয়েছে। মিলিটারিরা আজ কৃষ্ণপুর গ্রামে হামলাও করেছে। আমরা আজ রাতেই কৃষ্ণপুর হাই স্কুল ক্যাম্পে অপারেশন চালাবো। রাত তিনটায় আমাদের অপারেশন।'

সেই মতো মুক্তিযোদ্ধারা তৈরি হতে লাগল। আমি সোহাগকে ডেকে নিয়ে কিছু পরামর্শ দিলাম। ছোট্ট ছেলে সে! এতটুকুন ছোট্ট ছেলেকে কারও সন্দেহ করার কথা নয়। কৃষ্ণপুর ক্যাম্প সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা থাকা দরকার। কিছু গোপন খবরাখবর আগে থেকে জানা থাকলে অপারেশন চালাতে সহজ হয়। পরামর্শ দিয়ে আমি তাকে কৃষ্ণপুরে পাঠিয়ে দিলাম।

বলে দিলাম, 'তুই যদি ভালো খবর আনতে পারিস, তবে আমরা তোর মা-বাবা ও ভাই হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারব। তোর বোনটিকেও হয়ত আমরা জীবিত উদ্ধার করতে পারব।'

খবর নিয়ে সোহাগ ফিরে এল রাত আটটায়। এসে বলল, 'চাচাজান বিরাট খবর এনেছি। মিলিটারিরা আজ রাতে নাকি কোনো অভিযানে বের হবে না। আজ রাতে তারা ক্যাম্পে জুয়া ও গানের আসর বসাবে। রাজাকার শায়েখ ও শামসু মিয়া সবকিছুর ব্যবস্থা করবেন। মিলিটারি ক্যাম্পে আজ কেন্দ্র থেকে একজন কর্নেল আসবে। কর্নেলের সম্মানে এত কিছুর আয়োজন।'

সোহাগের কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি ভাবলাম–আজই অপারেশন চালানোর জন্য উপযুক্ত

রাত। কারণ বর্ষাকাল এখন। অমাবস্যা রাত। আকাশের অবস্থাও মেঘাচ্ছন্ন। মাঝরাত থেকে আশা করা যায় তুমুল বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যাবে। বৃষ্টি থাকাটা আমাদের জন্য মঙ্গল। বৃষ্টির মধ্যে মিলিটারিরা সাধারণত বের হয় না। তাছাড়া প্রমোদ শেষে শেষরাতে মিলিটারিরা ঘুমুতে যাবে। ঘুমের মধ্যেই হারামিগুলোর ওপর আমরা হামলা চালাবো। ভেবে অপারেশনের জন্য আমরা তৈরি হতে লাগলাম।

সেই রাতে সোহাগও আমাদের সাথে ছিল। যাত্রা মুহূর্তে হঠাৎ সে বায়না ধরে বসল। বলল, 'চাচাজান আমিও আপনাদের সাথে যাব।'

আমি বললাম, 'তুই যেতে চাস মানে? তোর যাওয়া মানে তো আমাদের জন্য বিরাট ঝামেলা। যুদ্ধে ঝামেলা যত কম থাকে ততই মঙ্গল। তাছাড়া তুই তো অস্ত্র চালানোও জানিস না।'

আমার কথা শুনে সোহাগ বলল, 'অস্ত্র চালানো না জানলেও আমার সাথে একটা অস্ত্র আছে। এটার নাম কিরিচ। দু-পাশে সমান ধার বিশিষ্ট লম্বা চাকু। আমি এটা ভালোই চালাতে জানি।'

আমি বললাম, 'পাগলামো করিস না তো বেটা। তুই বরং ক্যাম্পে শুয়ে ঘুমা। ক্যাম্প পাহারা দে। আমাদের অপারেশন যেন সফল হয় তার জন্য শুয়ে শুয়ে দোয়া কর।'

সোহাগ গোঁ ধরে বলল, 'না চাচাজান। আপনাদের সাথে আমি যাবই যাব। ওরা আমার মা-বাবাকে হত্যা করেছে। আমার বড়ো ভাইকে মেরেছে। আমার বড়ো বোনকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে। আমার আর বেঁচে থেকে কী লাভ বলুন? আমি ওদের অন্তত একজনকে মারতে পারলেও মনে করব আমি নিজের হাতে প্রতিশোধ নিতে পেরেছি।'

ওর এমন কথা শুনে আমার মনে হলো ওকে সাথে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো। কারণ ওর মনের ভেতর তেজ আছে। যুদ্ধ করতে দৃঢ় মনোবলের দরকার হয়। ওর মধ্যে তা পুরোপুরিই আছে।

পরে বললাম, 'আচ্ছা ঠিক আছে। চল তাহলে।'

কৃষ্ণপুর হাই স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছাতে আমাদের বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। পথে এক জায়গায় দুজন রাজাকার এসে হঠাৎ আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালো। রাজাকারদের হাতে বন্দুক। তাদের একজন অস্ত্র তাক করে বলল, 'তোরা নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধা। তোদের সাথে অস্ত্র দেখছি। জলদি অস্ত্র ফেলে দু-হাত ওপরে তুলে দাঁড়া। নইলে সবকটাকে গুলি করে মারব।'

রাজাকারটির কথা শুনে আমার শরীরে যেন হঠাৎ আগুন ধরে গেল। আমাদের সাথে ত্রিশজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। দুজন রাজাকারের কথায় যদি আমরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমরা কীসের মুক্তিযোদ্ধা হলাম? সে সময় মুক্তিযোদ্ধা হযরত আলী বিড়বিড় করে বলল, 'জালাল ভাই! মাটিতে ফেলে দিই?'

আমি বললাম, 'না। একটু সবুর কর।'

মুক্তিযোদ্ধা স্বপন বলল, 'কী করব তাহলে! ওদের কথায় আমাদের হাতের অস্ত্র ফেলে দেবো নাকি?'

আমি বললাম, 'না। অস্ত্রও ফেলবি না।'

অরুণ বলল, 'ভারি আপদ দেখছি! যাত্রাকালে এমন আপদ জুটলেই তো বিপদ।'

সে মুহূর্তে আমি হঠাৎ ইশারা করলাম। ইশারা করে বললাম, 'ওদের জাপটে ধর।'

ইশারা করা মাত্র আমাদের পক্ষ থেকে চার-পাঁচজন করে মুক্তিযোদ্ধা গিয়ে ওদের জাপটে ধরল। জাপটে ধরে প্রথমেই তারা রাজাকারদের বন্দুক দুটো কেড়ে নিল। ওদের নিরস্ত্র করল। চোখের পলকে নিরস্ত্র করাতে ওরা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। রাজাকার দুজন ভয়ে কবুতরের বাচ্চার মতো থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। রাজাকারদের একজন সহসা জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল, 'বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও!'

অমনি আমি ওই রাজাকারটির মুখের ভেতর বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, 'একদম চুপ। রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার। আর একটা কথা বলবি তো সোজা গুলি করে দেবো। গুলি করে মাথার খুলি ফুটো করে দেবো।'

আমার ধমক খেয়ে মনে হলো সে শান্ত হয়েছে। অমনি মুক্তিযোদ্ধা রাজু এসে ফিসফিস করে বলল, 'জালাল

ভাই ওদের গুলি করবেন না। ওই চামারের বাচ্চাদের মারতে বুলেট খরচ করবেন না। তাছাড়া গুলি করলে আওয়াজ হবে। লোকজনের ঘুম টুটে যাবে। আশপাশে খবর রটে যাবে। তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন। সোহাগের অস্ত্রটা কাজে লাগান।'

সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো সোহাগকে সাথে আনাটা আসলে মন্দ হয়নি। আমি ইশারা করতেই মুক্তিযোদ্ধা জামসেদ এসে সোহাগের অস্ত্রটি দিয়ে দুজনকেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো। বেটা রাজাকারদের গলা দিয়ে ট্যু শব্দটি বের করারও সুযোগ পেল না। রাজাকারদের শেষ করে আমরা সাবধানে পথ চলতে লাগলাম। পথ চলতে চলতে আমরা একেবারে কৃষ্ণপুর হাই স্কুলের কাছাকাছি চলে এলাম। অনুমান করলাম রাত তিনটার কম হবে না। ক্যাম্পের আশপাশে নীরবতা দেখে মনে হলো মিলিটারিরা ঘুমিয়ে গেছে। আমরা অস্ত্র রেডি করে দশজন করে তিনটি আলাদা দলে ভাগ হয়ে গেলাম। তিনদিক থেকে আমরা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলাম। সোহাগ আমার সাথেই আছে। আমার হাতে লোড করা এলএমজি। এলএমজি চালাতে সক্ষম এমন একজন করে আমাদের প্রতিটি দলেই রয়েছে। গ্রেনেড ছুড়তে পারে এমনও তিনজন রয়েছে তিন দলে।

এরই মধ্যে আষাঢ়ের বাদলধারা ঝরতে শুরু করল। মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় আমাদের জন্য শাপে বর হলো। বৃষ্টির মধ্যেই আমরা অপারেশন শুরু করলাম। আমার সংকেত পাওয়া মাত্র মুক্তিযোদ্ধারা মিলিটারি ক্যাম্পের ভেতর গ্রেনেড ছোড়া শুরু করে দিলো। সেই সঙ্গে এলএমজি, থ্রি নট থ্রি তো আছেই। আমাদের অতর্কিত আক্রমণে মনে হলো মিলিটারি ক্যাম্পে আসমানি গজব নাজিল হয়ে গেল। মিলিটারিরা কোনো কিছু বুঝতে না বুঝতেই ক্যাম্পটি তছনছ হয়ে গেল।

যে কয়জন মিলিটারি সজাগ ছিল তারা অস্ত্র তাক করে মরণপণ আমাদের দিকে গুলি করতে লাগল। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে বৃষ্টির মতো গুলি ছোড়ায় তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারল না। কয়েকজন মিলিটারি অস্ত্র ফেলে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করে তাদের প্রত্যেককে ভূমিতে শুইয়ে দিলো। মিলিটারি ক্যাম্পে আক্রমণ চলাকালে আমি হঠাৎ খেয়াল করলাম সোহাগ আমার সাথে নেই। নেই কেন? কী হলো ওর! আশপাশে খুঁজে দেখলাম। না, কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না। গেল কোথায় ছেলেটা? সোহাগের জন্য আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধক করে ওঠল।

ওদিকে অবিরাম গোলাগুলির পর একসময় আপনাআপনি মিলিটারি ক্যাম্প শান্ত হয়ে গেল। ওপাশ থেকে আমাদের ওপর আর কোনো গুলি আসছে না দেখে আমরা ধরে নিলাম মিলিটারিরা সবাই খতম। মিলিটারি ক্যাম্প আগুনে জ্বলছে।

ঠিক সে সময় হঠাৎ খেয়াল করলাম ছোটো একটা ছেলে অন্ধকারের মধ্যে একটা মেয়ের হাত ধরে মিলিটারি ক্যাম্প থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে। আমি বুঝতে পারলাম এটাই আমাদের সোহাগ। সাথের মেয়েটা হয়ত ওর বড়ো বোন। আমি গলা ছেড়ে চিৎকার দিয়ে বললাম, 'সোহাগ জলদি শুয়ে পড়। মাটিতে শুয়ে পড়।'

আমার ডাক শুনে সোহাগ তার বোনকে নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

যখন সবকিছু স্বাভাবিক হলো আমি সোহাগকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কীভাবে তোর বোনকে উদ্ধার করলি?'

জবাবে সোহাগ বলল, 'চাচাজান! যখন দেখলাম তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ আমার বোনের কথা মনে পড়ল। পরে আর মুহূর্তকাল দেরি না করে আমি বুকের ওপর ভর দিয়ে সাবধানে ক্যাম্পের ভেতর ঢুকে পড়লাম। ভেতরে ঢুকে আমি আমার বোনকে খুঁজতে লাগলাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমি তাকে পেয়ে গেলাম। দেখলাম, একটা রুমের ভেতর আমার বোনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। গড়িয়ে গড়িয়ে আমি ওই রুমের ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। দড়ি খুলে আমি তাকে মুক্ত করলাম। ঠিক সে সময় একজন মিলিটারি এসে আমাদের সামনে রুখে দাঁড়ালো। তখন অন্য একজন মিলিটারিকে বলতে শুনলাম–মি. কর্নেল! সেভ ইউরসেলফ। সেভ ইউরসেলফ। অমনি লোকটি কেমন যেন হতভম্বের মতো হয়ে গেল। কী করবে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। তখন আমার বোন আমার অস্ত্রটি নিয়ে ওই কর্নেল সাবের পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো। পাশ থেকে কেউ একজন আমাদের ওপর গুলি করতে

চাইল। তখন আপনি আমাদের মাটিতে শুয়ে পড়তে বললেন। আমরাও শুয়ে পড়লাম। ততক্ষণে কর্নেল সাব মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে আমি আমার বোনকে নিয়ে বুকের ওপর ভর দিয়ে পালিয়ে এলাম চাচাজান।'

সোহাগের সাহসের কথা শুনে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা অবাক হয়ে গেলাম। আনন্দে আমি তাকে কোলে তুলে

নিলাম। বললাম, 'শাবাশ বেটা শাবাশ। তোর মতো এমন সাহসী ছেলে এদেশের ঘরে ঘরে জন্ম নেওয়া দরকার।' ■

গল্পকার

গল্প

পতাকার ছবি

নুরুল ইসলাম বাবুল

ছবি আঁকে সেতু। গাছের ছবি। মাছের ছবি। ফড়িং আর টুনটুনির ছবি।

সবসময় আঁকে। বসে বসে আঁকতেই থাকে। আঁকে নদীর ছবি। পালতোলা নৌকার ছবি। কখনো আঁকে আকাশের ছবি। আঁকে মেঘের ছবি।

ছবি আঁকতে ভালো লাগে সেতুর। এঁকে এঁকে খাতা ভরে ফেলে। সেই আঁকাআঁকি বাবা দেখেন। মা দেখেন। দাদু ভাই দেখেন। সবাই তাকে ধন্যবাদ

জানায়।

আজ একটা নতুন ছবি আঁকল সেতু। রং করল। তারপর দাদুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

সেতুকে দেখেই দাদু বললেন, দেখি, কী এঁকেছ দাদাভাই।

সেতু ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, একটা নতুন ছবি এঁকেছি।

দাদু হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, দেখি তোমার নতুন ছবি।

সেতু খাতাটি দাদুর হাতে দিয়ে বলল, দাদু আমি পতাকা এঁকেছি।

সত্যি সেতু আজ পতাকা এঁকেছে। এঁকে রং করেছে। খাতা জুড়ে ফুটে আছে সবুজ আর লাল রং। দাদু দু-চোখ মেলে দেখছেন। দাদার চোখের ভেতর ভাসছে সেই পতাকার ছবি।

সেতু দৌড়ে চশমা নিয়ে এল। দাদার হাতে দিয়ে বলল, নাও, ভালো করে দেখো।

দাদা বললেন, দেখেছি ভাই। এটা আমাদের বাংলাদেশের পতাকা।

সেতু জানে এটা বাংলাদেশের পতাকা। স্কুলে প্রতিদিন এই পতাকা ওড়ে। এই পতাকার সামনেই ওরা সারি করে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেয়ে ওঠে–

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ওমা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

দাদু হাসতে হাসতে বললেন, খুব ভালো হয়েছে ছবিটা।

সেতু খুশি হয়ে গেল। বলল, তুমি সত্যি বলছ দাদুভাই।

–হ্যাঁ সত্যি বলছি। খুব ভালো হয়েছে ছবিটা।

–জানো দাদু, হাওয়া ম্যাডাম বলেছেন, ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় নাকি আমার নাম লিখেছেন।

–তাই নাকি! অবাক হয়ে বললেন দাদু ।

–হ্যাঁ, দাদুভাই। ম্যাডাম বলেছেন, অনেকগুলো স্কুল থেকে ছেলে-মেয়েরা আসবে। সবাইকে ছবি আঁকতে দিবেন। আমাদের ক্লাসে দিবেন পতাকা। বিচারক থাকবেন। অতিথিগণ থাকবেন। পুরস্কার দিবেন। আমি পুরস্কার জিতব।

দাদু সেতুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আদর করলেন। তারপর বললেন, তুমি পারবে দাদুভাই।

সেতু খুশি হলো। দাদু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, এই পতাকার গল্প কী জানো ভাই?

সেতু বড়ো বড়ো চোখে তাকালো দাদুর মুখের দিকে।

–পতাকারও গল্প আছে?

–হ্যাঁ, অনেক বড়ো গল্প আছে। নয় মাস যুদ্ধ করে আমরা এই লাল-সবুজ পতাকা পেয়েছি।

সেতু এবার দাদুর কাছে বায়না ধরল, বলো না দাদু, পতাকা পাওয়ার সেই গল্প।

দাদু বলতে শুরু করলেন, তখন পাকিস্তান নামক একটা দেশ ছিল। সেই দেশের ছিল দুটো অংশ। একটা পশ্চিম পাকিস্তান অন্যটা পূর্ব পাকিস্তান। আমরা ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। পুরো পাকিস্তান শাসন করত পশ্চিম পাকিস্তানিরা। আমরা লোকসংখ্যায় বেশি ছিলাম। তবু আমাদের কথা শুনত না তারা। দেশ চালাতো তাদের খেয়ালখুশি মতো। আর আমাদের আকাশে ওড়ানো হতো পাকিস্তানের পতাকা।

-এই লাল-সবুজ পতাকা উড়ানো হতো না, দাদু?

-না। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' এই সংগীতও গাওয়া হতো না।

-তাহলে?

-গাওয়া হতো পাকিস্তানি জাতীয় সংগীত।

-বলো, বলো দাদুভাই।

দাদু আবারও শুরু করলেন তাঁর গল্প-

আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতাম। সেটাও তারা কেড়ে নিতে চাইল। বলল, উর্দু ভাষায় কথা বলতে হবে। কিন্তু এদেশের মানুষ তা মেনে নিলো না। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ওদের আদেশ অমান্য করে মিছিলে যোগ দিল অনেকেই। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে মুখরিত হলো ঢাকার রাজপথ। মিছিলে গুলি চালালো পাকিস্তানি পুলিশ। শহিদ হলেন সালাম, বরকত, শফিক, রফিকসহ আরও অনেকে। তবু দাবি

ছাড়ল না দেশবাসী। শেষে আমাদের কথা মানতে বাধ্য হলো তারা। কিন্তু থামল না অন্যায় আর অত্যাচার। চলতেই থাকল বছরের পর বছর। এক সময় দেশের মানুষ বুঝতে পারল স্বাধীন হওয়া ছাড়া মুক্তি নেই।

সেতু এবার হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে বলল, আমি জানি, দাদুভাই।

দাদু হাসতে হাসতে বললেন, কী জানো, দাদু?

-বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

-হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক। ১৯৭১ সালে তাঁর ডাকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীর বাঙালি। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যখন দেশের মানুষ মারতে শুরু করল। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে লাগল। ঠিক তখন বসে থাকিনি আমরা। আমরাও অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নেমে পড়ি।

-দাদু তুমিও যুদ্ধ করেছ?

-হ্যাঁ, আমিও সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

-দাদু, তাহলে তুমিও তো একজন মুক্তিযোদ্ধা।

দাদু হেসে হেসে বললেন, ঠিক বলেছ ভাই। আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমরা নয়মাস ধরে যুদ্ধ করেছি। পাকিস্তানিদের খতম করেছি। এদেশ থেকে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা বিজয় লাভ করেছি। ১৬ই ডিসেম্বর সেই বিজয়ের দিন। এভাবে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। এই লাল-সবুজের পতাকা।

সেতু গল্প শুনে খুব খুশি হলো। একটু আগেই আঁকানো পতাকার ছবিটা আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিলো দাদুর বুকের উপর। গর্বে বুকটা ফুলে উঠল দাদুর। ■

গল্পকার

ইয়ানুর হোসেন, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

গল্প

দাদা ভাইয়ের রেডিও

আহমেদ সাব্বির

চঞ্চলের ঘর ভর্তি খেলনা। রেলগাড়ি, বন্দুক, রোবট, জাহাজ, বুলডোজার, বাইনোকুলার আরও কত কী। দেশি-বিদেশি দামি দামি খেলনা সব। কোনোটা বাবা কিনে দিয়েছে, কোনোটা মামারা আবার কোনোটা জন্মদিনের উপহার হিসেবে পেয়েছে। এত এত খেলনা তবু মন ভরে না চঞ্চলের। একটা ভাঙা মোবাইল, অচল টেবিল ঘড়ি অথবা জুতোর বাক্স পেলেই খেলতে বসে যায় সে। খেলা মানে খুলে খুলে ছড়িয়ে নেড়েচেড়ে দেখা। চঞ্চলের খেলার ঢং দেখে দামি খেলনাগুলো রাগে রি রি করতে থাকে।

মাঘ মাসের সকাল। কড়কড়ে রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ছে আকাশ থেকে। উঠোনে মাদুর পেতে খেলছে চঞ্চল। নতুন একটা খেলনা নিয়ে ব্যস্ত সে। খেলনাটা অদ্ভুত ধরনের। বড়ো সাইজের একটা পুরানো রেডিও। গতকাল বিকালে স্টোররুমে ঢুকেছিল। একটা পুরানো ট্রাংক থেকে সে টেনে বের করেছে। রেডিওটা বাদামি রঙের। কাঠের কাঠামোয় চারটি নব বসানো। উপরে অ্যানটেনা। টেনে ছোটো-বড়ো করা যায়। রেডিও পেয়ে চঞ্চল যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। নিজেকে সে বিজ্ঞানী মার্কোনি ভাবতে শুরু করল। সকাল সকাল খেলতে বসে গেল।

প্রথমে টান দিয়ে রেডিওর পিছনের হার্ডবোর্ডের ঢাকনাটা খুলে ফেলল। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল অনেকগুলো ছোটো ছোটো যন্ত্র একটা বোর্ডে বসানো। পাশেই বড়ো একটা স্পিকার। একটা লোহার পাত দিয়ে টোকা দিতেই পাতটি আটকে গেল চুম্বকে। আর চঞ্চল তখন আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল। নিচের দিকে চারটা ব্যাটারির বাক্স থাকলেও কোনো ব্যাটারি নেই তাতে। চঞ্চল রেডিওর যন্ত্রগুলো খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। রেডিওর নবগুলো খুলে ছাড়িয়ে ফেলল হ্যাঁচকা টানে। অ্যানটেনাটি টেনে লম্বা করে তাতে পাটের রশি বাঁধল। রেডিও থেকে আরো কী খোলা যায় তা ভাবতে লাগল। হঠাৎ উঠোনে সাইকেলের বেল শুনে চমকে উঠল। মাথা তুলে দেখল দাদা ভাই এসেছেন ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে।

চঞ্চলের দাদা গ্রামের নামকরা হোমিও ডাক্তার। গ্রামের গরিব মানুষকে তিনি পাঁচ টাকা ফি তে চিকিৎসা দেন। সারাদিন রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দাদা ভাই সাইকেলটা ছফেদা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখলেন। ব্যাগের ভিতর থেকে একটা তিলের খাজার প্যাকেট বের করলেন। 'কই? আমার দাদু ভাই কই?' বলে চঞ্চলের দিকে এগিয়ে এলেন। দেখলেন সে খেলছে। দাদা ভাই চঞ্চলের পাশে মাদুরে বসে পড়লেন। 'এই নাও তোমার তিলের খাজা ভাই'। চঞ্চল বলল- 'এখানে রাখো দাদা ভাই। পরে খাবো। এখন খেলছি।'

দাদা ভাইয়ের তখন চোখ পড়ল রেডিওর দিকে। রেডিওটাকে বেশ চেনা চেনা মনে হলো। কোথায় যেন দেখেছেন তিনি। 'কই দেখি দাদু ভাই তোমার খেলনাটা একটু দেখি। দাদা ভাই রেডিওটা হাতে নিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। অতীতে ফিরে গেলেন তিনি। ধীরে ধীরে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। চশমার নিচ দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল রেডিওর উপর। চঞ্চল দেখে অবাক হলো। 'দাদা ভাই তুমি কাঁদছ নাকি? এই যে পানি পড়ল'।

দাদা ভাই চঞ্চলের মাথায় হাত রাখলেন। বললেন- 'দাদু আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব। দেবে?' চঞ্চল বলল- 'হ্যাঁ। কেন দেব না। তুমি আমার দাদা ভাই না? বলো কী চাও?' 'তোমার রেডিওটা আমাকে দেবে? আমি মেরামত করব'। 'হ্যাঁ, এই নাও'।

চঞ্চল রেডিওটা দাদা ভাইয়ের হাতে তুলে দিলো। পরের দিন সন্ধ্যা বেলা। দাদা ভাই পারুলিয়া হাট থেকে বাড়ি ফিরলেন। সাইকেলটা রাখলেন উঠোনে। মনটা খুব খুশি খুশি। কাপড়-জামা ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় গিয়ে বসলেন। সাহায্যকারী চায়না গরম চা আর টোস্ট দিয়ে গেল। দাদা ভাই চায়ে চুমুক দিতে দিতে রেডিওটা অন করলেন। পারুলিয়া হাট থেকে মোরামত করিয়ে এনেছেন তিনি। নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা ধরলেন। খবর শুনতে লাগলেন চোখ বুঁজে।

রেডিওর আওয়াজ শুনে চঞ্চল ছুটে এল পড়া ফেলে। দাদা ভাইয়ের ঘরে কী বাজছে দেখতে। দেখে তো অবাক! 'দাদা ভাই রেডিও বাজছে? তার মানে তুমি ওটা চালু করে এনেছ?' 'হ্যাঁ ভাই। দেখো তো কত সুন্দর শব্দ। গান শুনবে নাকি?' চঞ্চল বলল- 'হ্যাঁ শুনব। তার আগে বলো তো তুমি রেডিও দেখে তখন কেঁদেছিলে কেন?' দাদা ভাই চঞ্চলকে বুকে টেনে নিলেন। চাদরের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বললেন– 'সে অনেক কথা। এই রেডিওটা আমার ছিল। এই রেডিও ঘিরে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অনেক বছর পর ওটাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম।' 'কেন দাদা ভাই?'

দাদা ভাই বলতে শুরু করলেন– '১৯৭১ সালের কথা। দেশে তখন ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধে। আমাদের তখন একটাই চাওয়া। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত হতে হবে। আমাদের আন্দোলন দেখে পাকিস্তানি সৈন্যরা আরো হিংস্র হয়ে উঠল। নির্যাতন শুরু করে দিলো সাধারণ মানুষের উপর। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলো। কলকারখানা ধ্বংস করে দিলো। লুটপাট করতে লাগল ডাকাতের মতো। বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করল তারা। মানুষ আতঙ্কে ঘর ছেড়ে পালাতে শুরু করল। দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিলো লাখ লাখ মানুষ । আমরা কোথাও গেলাম না। বাড়িতেই থেকে গেলাম। যুদ্ধের সময় গোলাগুলি আর কামানের গর্জনে আমরা ঘুমাতে পারতাম না। খেতেও পারতাম না। তোমার দাদি তোমার আব্বু আর ফুপুদের নিয়ে লুকিয়ে থাকত জঙ্গলে। রাত্রে ঘরে আসত। আমি সারাদিন আহত রোগীদের চিকিৎসা দিতাম।

দাদুর গল্প শুনে চঞ্চল পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। দাদা ভাইয়ের চাদরের মধ্যে বসে অবাক হয়ে শুনতে লাগল মুক্তিযুদ্ধের গল্প। কিছুক্ষণ পর পর বলল- 'তারপর? দাদা ভাই তারপর?'

তারপর, একদিন রাতে আমরা ঘরে বসে আছি। তোমার দাদি এককোণে বসে স্টোভে ভাত আর লালশাক রান্না করছে। এমন সময় দরজায় কারা যেন টোকা দিলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম হানাদার এসেছে। আমাদেরকে গুলি করে মারবে এখুনি। তোমার দাদি দোয়া পড়তে লাগল আর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি সাহস করে উঠে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম 'এত রাতে কে এসেছে?' দরজার ওপার থেকে একজন বলল– 'ভয় পাবেন না চাচাজি। আমরা মুক্তিসেনা, বাঙালি। তাড়াতাড়ি দরোজাটা খোলেন। চিকিৎসা নিতে এসেছি।' আমি ঝটপট দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম চারজন মুক্তিসেনা। সবার বয়স পঁচিশের মতো। হাতে রাইফেল। একজনের হাতে গুলি লেগেছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে টপটপ করে।

ওর নাম তপু। আমাদের পাশের গ্রামের ছেলে। আমি গুলিবিদ্ধ তপুকে শুইয়ে দিলাম। তারপর চিকিৎসা শুরু করলাম। একটা ছুরি আগুনে গরম করে তাতে ওষুধ মাখিয়ে গুলি বের করলাম। ছেলেটার রক্ত বন্ধ হলো। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ওরা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। কিন্তু চোখে ঘুম ছিল না কারো। ছিল কেবল স্বপ্ন। লড়তে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ ওদের প্রেরণা। জীবন দিয়ে হলেও লাল-সবুজের প্রাণ পতাকা ওড়াতে হবে মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশে।

ওরা সকাল থেকে কিছু খায়নি। তোমার দাদি ওদের গরম ভাত, আলুভর্তা আর লালশাক খেতে দিলেন। ওরা ভাত পেয়ে খুব খুশি হলো। তপুকে তোমার দাদি নিজ হাতে খাইয়ে দিলেন।

রাত তখন তিনটা বাজে। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। ওরা বলল–'চাচাজি আমাদের এখনি উঠতে হবে। অন্ধকার থাকতেই আমাদের বাংকারে ফিরতে হবে। জানাজানি হলে আপনারা বিপদে পরবেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা টের পেলে আপনাদের উপর গুলি চালাতে পারে। আমি বললাম– 'চালাক গুলি। মরলে মরব। তোমরা বিশ্রাম নাও তো। তোমরা দেশের বীর সূর্য সন্তান। তোমাদের একটু সেবা দিতে পেরে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে।'

ওরা কোনো কথা শুনল না। উঠে দাঁড়ালো। তপু আমার দিকে এগিয়ে এল। ওর হাতে একটা রেডিও। ওটা আমাকে দিয়ে বলল–চাচাজী আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আপনার ঋণ কখনো ভুলব না। এই রেডিওটা আপনি রাখেন। সব খবর শুনতে পাবেন। আমি ওকে বুকে টেনে নিলাম। ও বলল- ভয় নেই চাচাজী। আমরা এদেশ স্বাধীন করেই ছাড়ব। বঙ্গবন্ধুর সাহস আমাদের সঙ্গে আছে। রক্ত আর কত ঝরবে। ওদেরকে পালাতেই হবে।

'এটা সেই তপুর দেওয়া রেডিও। আমি, তোমার বাবা, ফুপু, দাদি যুদ্ধের সময় কান পেতে রেডিও শুনতাম। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে দেশের খবর শুনতাম। চরমপত্র, আকাশবানী আর মুক্তিযুদ্ধের গান শুনতাম। এতদিন রেডিওটা নষ্ট হয়ে পড়েছিল। তুমি খুঁজে বের করেছ। এজন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই।'

দাদা ভাইয়ের মুখে স্বাধীনতার গল্প শুনে চঞ্চল বিস্মিত হয়ে গেল। উত্তেজনায় ওর চোখ চকচক করতে লাগল। দাদা ভাইয়ের জন্য গর্ব হলো। রেডিওটা দূর থেকে বারবার দেখতে লাগল। যে রেডিওটা চঞ্চল খুলে খুলে দেখতে চেয়েছিল সেটা আর ধরতে ইচ্ছে হলো না। শুধু মনে হলো রেডিওটা একটা পবিত্র যন্ত্র। হাত দিলে ধুলোর ছাপ লেগে যেতে পারে। চঞ্চল বলল– 'দাদা ভাই, মা'কে বলব কালকেই যেন রেডিওতে একটা কাপড়ের কভার পরিয়ে দেয়। তাহলে আর ধুলো জমতে পারবে না। রেডিওটার নাম হবে 'জয় বাংলা রেডিও।' ■

গল্পকার

ভালোবাসি বাংলাদেশ

নুসরাত জাহান

বাংলাদেশ আমার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ
এই দেশে জন্মে আমি ধন্য,আমি গর্বিত।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে দেখা এই দেশের মাটিকে
তাই তো আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি।
সাড়ে সাত কোটি মানুষের কষ্টে রাঙানো
এই দেশের লাল-সবুজ পতাকা।
এমন সুন্দর দেশ বিশ্বের কোথাও আছে বলে আমি জানি না।
তাই তো এই দেশের কাছে মোদের আছে অনেক ঋণ।
দেশের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই,
দেশকে ভালোবাসার মতো আনন্দ
আর কোথাও খুঁজে পাই না।
তাই তো এই দেশে মোরা বার বার ফিরে ফিরে আসি।
প্রতিনিয়ত দেশকে ভালোবেসে
দেশের ছবি স্মৃতির পাতায় আঁকি।

বিজয় গাথা

রাশেদ আহাম্মেদ সাদী

শুকনো পাতায় ধুলার মাঝে
ছুটছে বাতাস জোরে,
আয়রে তোরা দেখ না দূরে
বিজয় কেতন উড়ে।
সবুজ পাতায় শ্যামল ছায়ায়
হিমেল বাতাস বয়,
আমার দেশের সোনার মানুষ
বাংলা কথা কয়।
এই দেশেতে আকাশ বাতাস
আছে কত গান,
বিজয় গাথা গাইব আজি
জুড়িয়ে যাবে প্রাণ।

বঙ্গবন্ধু

শাহ আলম বিল্লাল

এই বঙ্গের বন্ধু ছিল না
ছিল না স্বাধীন ভূমি
এই বঙ্গের বন্ধু সেজেছো
এসেছ মুজিব তুমি।

ডাক দিয়েছিলে রেসকোর্সে
হয়েছে বাঙালি ক্রোধে
সাতই মার্চের ভাষণ শুনে
বাঙালিরা প্রতিশোধে।

এই বাঙালির বন্ধু তুমি
তুমি তো ছিলে মিতা
মিতা থেকে তাই অবশেষে তুমি
মহান জাতির পিতা।

সাড়ে সাত কোটি জনতাকে তুমি
দিয়েছ চেতনা মুক্তি
যা কিছু আছে প্রস্তুত থাকো
এ ছিল তোমার উক্তি।

ঐতিহ্য গোলদার, ৩য় শ্রেণি, এম. বদিউজ্জামান বিদ্যানিকেতন, মোল্লাহাটা, বাগেরহাট

হাঁটুতে শেলের টুকরো

রহিমা আক্তার মৌ

গত বছর আমাদের স্কুলের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন হাবিলদার হেদায়েত। নামটা হাবিলদার হেদায়েত হলেও তিনি প্রমোশন পেয়ে পেয়ে বড়ো অফিসার হয়েছেন। তবুও গ্রামের প্রিয় মানুষের কাছে তিনি সেই হাবিলদার হেদায়েত রয়ে গেছেন। একাত্তরের সেই হাবিলদার আমাদের আজকের প্রধান অতিথি। প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে অনেকেই উনার কাছে আবদার করেন কিছু স্মৃতিকথা বলার। হাবিলদার হেদায়েত বলতে শুরু করেন–

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার। এটা কোনো সামরিক অভিযান ছিল না, ছিল সাধারণ শোষিত মানুষের মুক্তির অকুতোভয় অসম সংগ্রাম। দীর্ঘদিন পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে করতে আমরা হাফিয়ে উঠি। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়, যুদ্ধ ছাড়া সেদিন আমাদের স্বাধীনতা নেই এটা বুঝতে পেরেই এই দেশকে মুক্ত করার জন্যে এদেশের অগণিত নিষ্পেষিত মানুষের সাথে আমিও নেমে পড়ি দুর্বার মুক্তিসংগ্রামে।

নোয়াখালী ছিল দুই নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুত। সব সেক্টরের মধ্যে দুই নম্বর সেক্টর ছিল অন্যতম। সেক্টর

এলাকা, অফিসারের সংখ্যা, গেরিলা অ্যাকশন সব দিক থেকেই এই সেক্টর ছিল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের দুর্নিবার সাহসী ক্র্যাক প্লাটুন ছিল প্রধানত এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। মুক্তিযুদ্ধে দুই নম্বর সেক্টর ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও নোয়াখালী নিয়ে গঠিত হয়। ৪- ইস্টবেঙ্গল, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর ইপিআর বাহিনী নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টরটি। দুই নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর ছিল আগরতলার ২০ মাইল দক্ষিণে মেলাঘরে। দুই নম্বর সেক্টরকে ছয়টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়, সাব-সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন সাব-সেক্টর কমান্ডার।

যুদ্ধ শুরুর দিকের ঘটনাগুলো আগে কয়েকবার বলেছি। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ৫ নম্বর সাব-সেক্টর নির্ভয়পুরের চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত হাসনাবাদে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয়। সে যুদ্ধে আমি সরাসরি অংশগ্রহণ করি। সেদিন আমার বাম হাঁটুতে শেলের টুকরো পড়ে, আমি আহত হই। সেই সম্মুখ যুদ্ধে দুই পক্ষেরই সৈন্য নিহত হয়। গুরুতর আহত বলে আমাকে নেওয়া হয় হাসপাতালে, কে কে নিহত হয়েছে তাদের নাম জানতে পারিনি। অসুস্থ অবস্থায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ইপিআরের সদস্য মো. আবুল হোসেন শহিদ হয়েছেন। সেদিন মনে হলো আমার পাঁজরের একটা অংশকে হারিয়েছি। সেই অবস্থায় ছুটে গেছি ওকে একটি বার দেখার জন্যে। কিন্তু তাকে আর দেখতে পাইনি।'

এই বলে হাবিলদার হেদায়েত অঝরে কাঁদতে লাগলেন। উনার কথায় বুঝতে পারি আবুল হোসেন উনার কত প্রিয় ছিলেন। হাবিলদারের মতো অনেক কিশোর, তরুণ, যুবক নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিলেন যুদ্ধে। ১৯৭১ সালের সেই টগবগে এক যুবক আজ অনেকটাই বৃদ্ধ।

১৯৭১ সাল, দেশের অবস্থা মোটেই ভালো না। মাত্র কিছুদিন আগে ঢাকা সেনানিবাসে কর্মজীবন শুরু করেন হেদায়েত। হেদায়েতের গ্রামে এই প্রথম কেউ সেনাবাহিনীতে চাকরি পেয়েছে। গ্রামের মুরুব্বিরা সবাই তাকে হাবিলদার হেদায়েত বলে ডাকে। চাকরি পাওয়ার পর থেকে হেদায়েত এর কদর খুব বেড়েছে।

যুদ্ধ যখন ছড়িয়ে যেতে থাকে তখন প্রথমে বাংলাদেশ সীমান্তকে চার ভাগে ভাগ করে। এরপর এগারো ভাগে মানে এগারো সেক্টরে ভাগ করে সীমান্তকে। প্রতিটি সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ঠিক করা হয়।

আশেপাশের গ্রামের বিবাহ উপযুক্ত মেয়ের বাবারা যখন তখন আসে হেদায়েতদের বাড়িতে। ওর বাবা সালেক মাস্টারের সাথে আড্ডায় মেতে উঠে। হেদায়েত ছুটিতে বাড়ি আসবে শুনলে এটা সেটা নিয়ে আসে। বলতে গেলে তখন বাড়িটা খুবই জমজমাট থাকে।

হেদায়েতরা দুই ভাই এক বোন। ওর মা রাহেলা বেগম বুঝেন সবাই কেন এখন এই বাড়িতে এত্ত আসে। মাস্টার সাহেবের মতো অত চুপচাপ তিনি নন। মাঝে মাঝে পাড়া প্রতিবেশির মুখের উপরেই বলে দেন-

দুদিন আগেও বিপদে হড়লে কাউরে ডাকলে কেউ আইতো না, আর অন এদিক হেদিক দিয়া ক্যাল হিঁড়া বায়।

মুখের উপর কড়া কথা সহ্য করতে পারে না সালেক মাস্টার। তাই বলে বসে-

হুনো হেদায়েতের মা, দিন হগলের এক যায় না। তোয়ারে আর কতবার কইয়ুম যে কারো মুখের উপর অমন করি কতা কইবা না।

কে শুনে কার কথা, রাহেলা বেগমের ইচ্ছা হইলেই অমন বকবক করে।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে হেদায়েত ছুটি কাটিয়ে শহরে যায়। যাবার সময় সবার থেকে বিদায় নেয়, দোয়া নেয়। মা বাবাকে বলে-

যে-কোনো সময় যুদ্ধ লাগতে পারে। তোমরা সবাই সাবধানে থাকবে।

বাবা মা দুজন অশ্রুজল নিয়ে ছেলেকে বিদায় দেন।

হেদায়েত গিয়ে কাজে যোগ দেয়। একই দিনে কাজে যোগ দেয় হেদায়েতের বন্ধু মো. আবুল হোসেন। আবুল হোসেন ইপিআরে (বর্তমান বিজিবি) চাকরি করত। ওর বাড়ি হেদায়েতের পাশের ইউনিয়নে। মার্চের শুরু থেকে দেশের অবস্থা অনেক খারাপ হয়। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। অন্যদিকে পাকিস্তানিরা গোপনে পরিকল্পনা করে। ২৫শে মার্চের কালরাত্রির পর টিক্কা খান মার্শাল ল জারি করে। রাতের অন্ধকারে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) উপর।

নিজের কর্মস্থান থেকে পালায় হেদায়েত। সাথে নেয় সরকার থেকে পাওয়া নিজের ব্যবহৃত অস্ত্র। অন্য দিকে জানতে পারে ওর বন্ধু আবুল হোসেনও পালিয়েছে। আবুল হোসেনের সাথের অনেককে হত্যা করেছে পাকসেনারা। যারা পালাতে পারেনি তাদেরকে বন্দি করেছে। দুই বন্ধু এক হয়ে গ্রামে চলে আসে, কিন্তু হেদায়েত বাড়িতে আসেনা। গ্রামের কয়েক কিশোরকে সাথে নিয়ে একটা দল করে। ওদেরকে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়। কিন্তু একটা অস্ত্র দিয়ে কীভাবে সম্ভব? সব সহপাঠীরা মিলে রাতের অন্ধকারে পাশের একটা থানা ঘেরাও করে। থানার অস্ত্র লুট করে সবাই। রাইফেল, এলএমজি, রিভলবার, গুলি সংগ্রহ করে। এগুলো পেয়ে ওদের সাহস বেড়ে যায়।

অস্ত্র সংগ্রহ করে ওদের পুরোদমে কাজ শুরু হয়। ছোটো ছোটো করে দল গঠন করে। একজন করে দলের নেতা থাকে। ছুটিতে আসা সেনাবাহিনী, আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, আনসার, পুলিশ সবাইকে জড়ো করে এক প্লাটুন সৈন্য গঠন করে। যার নেতৃত্ব দেয় হেদায়েত। এরপর দুই দল করে। একদলের নেতা থাকে হেদায়েত অন্য দলের নেতা আবুল হোসেন। দুজনের দলের মাঝে যে সবচেয়ে ভালো ট্রেনিং শেষ করতে পারে তাকে নেতা করে আরেকটি দল করে। এভাবেই ওদের সৈন্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে দলের সংখ্যাও।

বাঙালি সৈন্যরা আশপাশের থানা, পোস্ট অফিসসহ বিভিন্ন সরকারি অফিস দখল করছে। দখল করতে গিয়ে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুই পক্ষের সৈন্য আহত নিহত হচ্ছে। কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে পাকবাহিনীর সঙ্গে বাঙালিদের বড়ো এক সংঘর্ষ হয়, সেখানে অনেক বাঙালি নিহত হয়। সেই যুদ্ধে হেদায়েত ও আবুল হোসেন দুজনেই ছিল। যুদ্ধ যখন ছড়িয়ে যেতে থাকে তখন প্রথমে বাংলাদেশ সীমান্তকে চার ভাগে ভাগ করে। এরপর এগারো ভাগে মানে এগারো সেক্টরে ভাগ করে সীমান্তকে। প্রতিটি সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ঠিক করা হয়। এতে করে যুদ্ধ করার সময় এলাকা চিহ্নিত করতে সুবিধা হয়। ওরা দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে পড়ে।

হেদায়েতদের দুই নম্বর সেক্টরকে আবার কয়েকটি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। এতে করে দুই বন্ধু দুই সাব-সেক্টরে পড়ে যায়। যার ফলে ওদের যোগাযোগ কম হতে থাকে। তবুও দুজনের মাঝে যোগাযোগ চলতো। যুদ্ধ চলতে চলতে সবার বিপদ বাড়তে থাকে। বড়ো কোনো অপারেশন থাকলে অনেক সৈন্য একসাথে করা হতো। এভাবে একই সাথে যুদ্ধ করে দুজনেই। কিন্তু কারো খবর তখন কেউ জানতে পারেনি।

যুদ্ধের সময় এমন অনেক ঘটনা হয়েছে যে একই যুদ্ধে বাবা ছেলে অংশ নিয়েছে। নিয়েছে সহোদর ভাইয়েরা। কেউ শহিদ হয়েছে কেউ হয়েছে আহত। কিন্তু বাংলার বীর সেনারা জীবন বাজি রেখেই দেশকে শত্রুমুক্ত করেছে। আপনজন হারিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। নিজে আহত হয়ে সেই যুদ্ধের চিহ্ন আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন। ■

সাহিত্যিক, কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক

বিজয় মানে

শাকিব হুসাইন

বিজয় মানে স্বাধীনতা
বিজয় মানে মুক্তি
বিজয় মানে সবার সাথে
শান্তি রক্ষার চুক্তি ।
বিজয় মানে শত্রুকে তো
বিতাড়িত করা
বিজয় মানে পাখির মতো
যখন খুশি ওড়া ।
বিজয় মানে মায়ের ভাষায়
মনের কথা বলা
বিজয় মানে স্বাধীন দেশে
স্বাধীনভাবে চলা ।
বিজয় মানে লাল-সবুজের
এই স্বাধীন পতাকা
মনের ঘরে থাকবে বিজয়
সারাজীবন আঁকা ।

একাদশ শ্রেণি
দিনাজপুর সরকারি কলেজ

সোনার বাংলাদেশ

ফারিন আহমেদ

বিজয় মানে লড়াই স্মৃতি
লাল -সবুজ পতাকা।
বিজয় মানে নিজ দেশে
স্বাধীন বসবাস।
বিজয় মানে হিংসা বিদ্বেষ বাদ দিয়ে
দেশটাকে গড়া।
বিজয় মানে বীরের জাতি
রঙিন করা মুখ।
বিজয় মানে আনন্দ উল্লাস
নেই কোনো আর ভয়।
বিজয় মানে রক্ত দিয়ে কেনা
সোনার বাংলাদেশ।

৯ম শ্রেণি, আলাতুন্নেসা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বিজয় কথা

সামিন ইবনে মাহমুদ

বিজয় দিবস এলে
সাজি লাল-সবুজের বেশে
স্বাধীন হয়েছে দেশ মাতা
নয় মাস যুদ্ধ শেষে।

ছোটো বড়ো সবাই
করেছে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ
পাকি সেনাদের হারিয়ে দিয়ে
দেশ হয়েছে শত্রু মুক্ত।

এমন দেশটি পাবো না তো
খুঁজে সারা দুনিয়ায়
যাদের জন্য পেলাম দেশ
তাঁদের সালাম জানাই।

দশম শ্রেণি, কুমিল্লা জিলা স্কুল

মুক্তিযোদ্ধা দাদুর গল্প

শিবুকান্তি দাশ

দাদুর হাতে এখন প্রচুর সময়। সকালে ঘুম থেকে উঠে পত্রিকা পড়ার সময় এক কাপ কড়া লিকারের চা না হলে তার চলে না। সবাই ঘুমে থাকে। আলোর মা এসেই প্রথমে দাদুকে চা দেবে। দাদুর চায়ের পর সকালের নাশতা তৈরি। অন্য কাজ শুরু করবে পরে। আলোর মা আসতে কোনোদিন একটু দেরি হলে দাদু হইচই শুরু করে দেবে। দাদুর হাঁকডাক শুনে সবার ঘুম ভেঙে যায়। দেখা গেলো ঐ সময় আলোর মা কলিংবেলটা টিপেছে। আর যায় কই দাদুর পাল্লায় পড়ো। হন্তদন্ত হয়ে বারান্দা থেকে দাদু আসতে আসতে মা দরজা খুলে দেয়। দাদু দেখার আগেই কিচেন রুমে ঢুকে পড়ে। আসছে আলোর মা, বলে গর্জে ওঠে দাদু। এসময় মা ঘুম ঘুম চোখে জবাব দেয় আলোর মা আসছে। আমি চা বসিয়ে দিয়েছি। আপনি ঘরে যান বাবা, আলোর মা চা নিয়ে আসছে। দাদু আর কথা বাড়ায় না। তবে বিড়বিড় করে আলোর মাকে দুকথা বলতে বলতে নিজের ঘরে গিয়ে আবার পত্রিকার পাতায় চোখ রাখে।

দাদু বিকেলে হাঁটতে বেরোয়। সাথে শাওনকেও যেতে হয়। এবাড়ি ওবাড়ি পাড় হয়ে মাটির রাস্তায় যায় দাদু ওখানে একটু জিরিয়ে নেয়। সাথে পানির বোতল নিয়ে যায়। দাদু পানি খায়। আর নানান কথা বলে। দাদুর চাকরি জীবনের কথা বলে। কখন কী হয়েছিল, কেন হয়েছিল। এ সময় দাদু কী করছিল। প্রতিদিন শুনে শুনে অনেক কথা শাওনের এখন মুখস্থ। তার মনে হয়ে যায় দাদু কোন কথাটার পর কোন কথাটা বলবে।

শাওন ক্লাস সেভেনে পড়ে। দাদুর রেলওয়ে অফিসেই

বাবার চাকরি। প্রতি সপ্তাহে দু-দিনের জন্য বাড়িতে আসেন। এ সময় বাবার সাথে শাওন অনেক মজা করে। ঘুরে বেড়ায়, বাইরে খাওয়াদাওয়া করে, পার্কে যায়। শাওনের বড়ো দুই বোন রয়েছে। ওরাও লেখাপড়া করে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। বাবা বাড়িতে। সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। ছোটো ফুফুর বাড়িতে দাওয়াত। এমনিতেই। কোনো অনুষ্ঠান নেই। বৃষ্টি আসতে পারে। শাওন ফুফু বাড়ি যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করে দেয়।

আমার ভালো লাগছে না। বৃষ্টিতে কোনো মজা হবে না। ভিজলে অসুখও হতে পারে। তারচেয়ে আজ সারাদিন দাদুর সাথে গল্প করব। সাথে সাথে শাওনের দলে যোগ দেয় বড়ো বোন অমি ও সুমি। ওদেরও ভালো লাগছিল না। বৃষ্টি কার ভালো লাগে বলো। রাস্তাঘাট কাদায় ভরে যায়।

সবার মুখে না না শুনে শাওনের মা বলল, আপা এত করে দাওয়াত দিয়ে গেলেন আমরা না গেলে কী মনে করবে। বেলা বাড়তে বাড়তে বৃষ্টি তো নাও থাকতে পারে। আর আমরা কী হেঁটে যাব নাকি।

ওরা যেতে চাচ্ছে না যখন বাদ দাও না। আমি আপাকে ফোনে বলে দিচ্ছে আমরা আজ যাচ্ছি না। শাওনের বাবা জবাব দেয়।

বাবা বাবা এক্ষুনি বলে দাও। অমি বাবার ফোনটা ড্রয়িংরুমে এনে দেয়ই।

কোকিলের গায়ের রঙের মতো চারদিক অন্ধকার এই বুঝি বৃষ্টি এল। দাদুকে ঘিরে বসে সবাই। দাদু পত্রিকায় কী যেনো খুঁজে। বার বার পত্রিকার পাতা উলটাচ্ছে।

দাদু এত বেলা করে তো পত্রিকা পড়ে না। আজকে বিশেষ কিছু ছেপেছে নাকি। ধুমকেতু খুঁজছো যেন। সুমির এ কথায় দাদু এবার পত্রিকার পাতা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। আমি ধুমকেতুই খুঁজতে ছিলাম। তোমরা বইতে পড়েছ? আমি দেখেছিলাম। সেই যুদ্ধের বছর। দাদু যেন এখনো একাত্তর সালে আছে।

ধুমকেতুর কি লেজ থাকে দাদু? শাওনের এ কথায় হি হি হি হি করে হেসে ওঠে সবাই। দাদু সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, দাদু ভাই তো ঠিকই বলেছে। ধুমকেতু ভাগ্যবান ছাড়া কেউ দেখতে পায় না । প্রতি বারো বছর পর পর এ ধুমকেতুকে দেখা যায়। যুদ্ধের বছর আমরা যে ধুমকেতুকে দেখেছিলাম তখন একটা অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সেদিনও মেঘলা আকাশ ছিল। আমরা কেলিশহর ভট্টাচার্যের হাটের কাছেই ওঁত পেতে ছিলাম। সেদিন ছিল হাটবার। দুইজন রাজাকার বাজারে আসার সংবাদ পেয়ে তাদের মায়ার করার জন্য কমান্ডার নির্দেশ দেয়। যুদ্ধের জন্য হাট তেমন জমেনি। অল্প কিছু লোকজন আসছিল। আমাদের ইনফরমার খরর পাঠিয়েছে রাজাকার দুইজন বাজারে আছে। ইনফরমারদের একজন কচুর লতি আর কয়েকটা পেঁপে বিক্রির জন্য বাজারে বসে আছে। এদিকে আমরা অপারেশনের টেনশনে কাঁপতেছি। আমরা অন্ধকারে একটা ঝোপ মতো জায়গায় অস্ত্র নিয়ে প্রজিসনে আছি। ওরা বাজার থেকে বের হয়ে আসলেই অ্যাটাক করব। এমন সময় বিজলির মতো আলো ছড়িয়ে আমাদের পাশ দিয়ে ধুমকেতুর প্রস্থান।

তারপর কী হলো দাদু শাওনের প্রশ্ন।

বলছি। আমরা ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু সাহস হারাইনি। আমাদের পজিশন আবার নতুন করে নিতে হয়েছে।

আচ্ছা দাদু আপনারা পাকিস্তানের মিলিটারিদের না মেরে রাজাকারদের মারতে গেলেন কেন? শুনেছি মিলিটারিরা আমাদের দেশের মানুষদের গুলি করে করে মেরেছে। ওদের কোনো দয়ামায়া ছিল না। অমি বলল।

হ্যাঁ দাদু ভাই। ঠিকই শুনেছ। মিলিটারিদের কোনো দয়ামায়া ছিল না। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালের মধ্য রাতে বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন সেই রাত থেকেই ওরা মানুষকে পশুর মতো গুলি করে মেরেছে। আর ওদের সহযোগিতা করত রাজাকার, আলবদর

আলশামস। ওরা এলাকায় এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। রাজাকার রুস্তম ও কালু ছিল ধলঘাট, কেলিশহর এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজাকার। ওরা অনেক লোককে ধরে নিয়ে যেত মিলিটারি ক্যাম্পে। মিলিটারিদের খবর দিত কোন বাড়ির কোন লোক মুক্তিযুদ্ধে গেল। পরদিন মিলিটারি গিয়ে ওদের বাবা, ভাই, না হয় উপযুক্ত মেয়ে থাকলে ধরে নিয়ে নির্যাতন করত। পরে রাতের অন্ধকারে ওদের মেরে হয় কবর দিত না হয় নদীতে ফেলে দিত।

রাজাকারদের সেদিন মারতে পেরেছিলেন দাদু? আবার শাওন প্রশ্ন করে।

এবার দাদু নড়েচড়ে বসে। চশমাটা হাতে নেয়। বীরের ভঙ্গিতে চোখমুখ লাল করে মাথা উঁচু করে বললেন, একজনকে মারতে পেরেছিলাম। গুলি করার পর রুস্তম রাজাকার মারা যায়। কালু রাজাকার ঝোপের ভেতর চলে যায়। অন্ধকারে তাকে গুলি করতে গিয়ে আমাদের সাথে থাকা সবুরকে গুলি করে দেয় শামসু। অন্ধকারে তখন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমরা খুশি আমাদের অপারেশন সাকসেস। আমাদের আনন্দের কয়েক মুহূর্তে রাজাকার কালু পালিয়ে যায়। আমরা শেল্টারে ফিরতে গিয়ে দেখি সবুর নেই। আমরা ছিলাম পাঁচজন তখন আছি চারজন। পড়ে আছে শহিদ সবুরের লাশ। এ লাশ আমরা একটু দূরে একটা পুকুরপাড়ে কবর দিই। সেই দিনের কথা মনে হলে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। যুদ্ধে এই একটা ঘটনা আমাদেরকে আজও খুরে খুরে খাচ্ছে। বলতে বলতে দাদুর দু'চোখ জলে ভিজে ওঠে। ■

গল্পকার

মুহসিনা রহমান, অষ্টম শ্রেণি, বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবলু

নাসিম সুলতানা

বাবলু জিদ ধরল মুক্তিযুদ্ধে যাবে। কেউ ওর কথায় কান দিলো না। কারণ, যুদ্ধে যাওয়ার মতো বয়স ওর হয়নি। বাবলু কিন্তু তার ভাবনা থেকে পিছপা হয় না। সে যাবেই যাবে। দেশের এই শোচনীয় মুহূর্তে সবাই ছুটছে যুদ্ধ করতে, আর সে বসে থাকবে এটা মানতে পারে না। সে বার বার করে তার মনের ইচ্ছাটা জানায় বাড়ির বড়োদের কাছে। বড়োরা বলে, যুদ্ধ করবে বড়োরা। তুমি পারবে না। এসব কথা শুনে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। তবুও সে তার ভাবনা থেকে এক চুল সরে আসে না।

পাড়ার হাসান ভাই। মাস্টার চাচার ছেলে। কলেজে পড়ে। সেও যাচ্ছে যুদ্ধে। বাবলু তাকে গিয়ে মনের ইচ্ছাটা জানায়। হাসান ভাই হাসে। সেও চায় না ছোট্ট বাবলু যুদ্ধে যাক। বলে, তুমি কী জানো, থ্রি নট থ্রি রাইফেলের ওজন কত? সাড়ে সাতসের। ওটা উঁচিয়ে ছুটতে হবে যুদ্ধের ময়দানে। বাপরে.. বাপ! জানো তো পাকিস্তানি সেনারা জানোয়ারের মতো শক্তিশালী। দুনিয়ার সেরা যুদ্ধবাজ। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বড়োরাই হিমশিম খাবে। তারচেয়ে তুমি মায়ের কাছে থাকো। মাকে একলা রেখে তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হবে না।

না না না... সে যুদ্ধে যাবেই। দেশের ডাকে সে বসে থাকতে পারবে না। পড়ার ঘরে সে একা একা বসে মনে মনে ছক কাটছে। যুদ্ধে কীভাবে সে খানসেনাদের পরাস্ত করবে।

মায়ের স্পর্শে ওর ভাবনায় ছেদ পড়ে। মাথায় মায়ের স্নেহের হাত। মা বলেন, তুমি আমার বীর ছেলে। যুদ্ধে না গিয়েও তুমি মুক্তিযোদ্ধাদের সমান অবদান রাখতে পারো।

বাবলু মায়ের মুখের দিকে তাকায়। বলে, যুদ্ধে যারা গেছে তারা ট্রেনিং নিচ্ছে। কঠিন ট্রেনিং কী-করে রাইফেল ধরতে হয়, কী করে ক্রলিং করতে হয়, কী করে শত্রুর অবস্থানের আক্রমণ চালাতে হয়। আর মুক্তিযোদ্ধারা তো ক্যাম্পে থাকে। আমি ঘরে থেকে কীভাবে যুদ্ধ করব?

মা ছোট্ট বাবলুর এমন বুদ্ধিদীপ্ত কথায় অবাক হন। ভাবেন, এটুকু ছেলে যুদ্ধের এতসব কৌশল কীভাবে জানল! তারপর ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন, তুমি যা বলেছ সব ঠিক। তবে যুদ্ধ নানাভাবে করা যায়। সবাই কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ করে না। যারা যুদ্ধ করে তাদের যুদ্ধকে সহজ করে তোলার জন্য সহযোগী যোদ্ধারা কাজ করে। এদের একটি অংশ গোপনে শত্রুদের খোঁজখবর নেয়। তারপর সে খবর পৌঁছে দেয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। এতে শত্রুর অবস্থান বুঝে আক্রমণ করা যায়। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়াও যুদ্ধ। মা বললেন, যারা যুদ্ধে গেছে তারা তোমার ভাই, মামা, চাচা। তাদের নানাভাবে সহযোগিতা করতে পারো তুমি।

বাবলু মায়ের কথা শুনে একটু ভাবল। অবাকও হলো তার সহজ-সরল মায়ের মুখে যোদ্ধা হওয়ার এমন বিকল্প কৌশল জেনে। সে মাকে শুধাল, আচ্ছা মা, কী ধরনের কাজ আমি করতে পারি? মা বললেন, আর একদিন বলব, অনেক বেলা হয়েছে। এখন তুমি হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

না, মা, এখনই বলো। বাবলু মায়ের আঁচল ধরে আবদার করল।

মা কী আর করবে। বললেন, সেটা তো একবার বলেছিই। তো আবার শোনো, তুমি ছোটো, তাই তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। পথে খেলতে খেলতে খেয়াল রাখবে গ্রামের রাজাকাররা কোথায় যায়, কী আলাপ করে। ওরা তো সব খবর পাক হানাদারদের ক্যাম্পে পৌঁছে দেয় রোজ। পারলে ওদের পিছুপিছু সেখানে গেলে। ওদের খুশি করতে মাঝে গাছের কলা, পেঁপে ওদের দেবে। দেখবে তোমাকে আপন ভেবে ওরা অনেক তথ্য কথাচ্ছলে বলে ফেলবে। সেসব কথা তুমি মুক্তি ভাইদের কাছে জানিয়ে দেবে। তাছাড়া তাদের জন্য খাবার, পানি, গামছা এসব দিয়ে আসতে পারো। যেসব মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে আহত হয়েছে তাদের জন্য ওষুধ পথ্যও দিয়ে আসতে পারো। বুঝলে, এটা কত বড়ো কাজ। তুমিও তখন বীর মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের চেয়েও বড়ো যুদ্ধ এটা। তোমাকে সবাই বলবে ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধা।

মায়ের কথাগুলো বাবলুর কাছে দারুণ লাগল সে এসব কথা মনের মধ্যে গেথে রাখল।

বাবলুদের গ্রামে কোনো মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প নেই। গ্রামের শেষে থানাসদর। সেখানে পাকসেনাদের ক্যাম্প। আর পাশের গ্রামে রাজাকারদের আঁখড়া। বাবলু মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প কোথায় তা জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল। তবে মাকে সে তার ভাবনার কথাটা জানালো না।

এপ্রিল মাস। প্রচণ্ড গরম। একদল রাজাকার আর তিনজন পাকহানাদার পথের পাশে বাবলুদের ডাব গাছের কাছে এসে দাঁড়ালো। বাবলু জানালা দিয়ে দেখে বুঝতে পারল তারা ডাব পাড়তে এসেছে। বাবলু বুদ্ধি করে একটা দা আর একগোছা দড়ি নিয়ে সেদিকে ছুটল। গিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ালো। বাবলুকে দেখে একজন রাজাকার চিনতে পারল। বাবলুও তাকে চেনে। পাশের গ্রামের মতলব মিয়া। মতলব চোরা নামে লোকজন ডাকে। সে গ্রামের কুখ্যাত সিঁধেল চোর। তবে রাজাকারের পোশাক পরায় তাকে অন্যরকম লাগছে। বাবলুর আব্বার কাছে সে কৃতজ্ঞ। কারণ, একবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। গ্রামের ছেলেরা ওকে খুব মারধর করতে থাকে। বাঁশ, লাঠি, ঝাঁটা.. যা পেয়েছে তাই দিয়ে রামপিটুনি শুরু করে। এরই মধ্যে বাবলুর আব্বা মুরাদ সাহেব গিয়ে হাজির। তিনি মারকুটে ছেলেদের হাত থেকে মতলব চোরাকে বাঁচান।

মারের চোটে সারা শরীর কেটে-ছুলে যাচ্ছেতাই। মুরাদ সাহেব বললেন, আগে ওর চিকিৎসা, তারপর অন্যকিছু। তিনি ছেলেদের বকাঝকা করে বললেন, সে চুরি করতে গেছে, তবে করতে পারেনি। তারপরও সে অপরাধ করেছে। কিন্তু তোমরা তো নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারো না। থানা-পুলিশ আছে এজন্য। ওদের হাত থেকে মতলবকে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি মোমেন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। নিজের টাকায় ব্যান্ডেজ করিয়ে, অষুধ পথ্য কিনে দিয়ে সঙ্গে পাউরুটি, বিস্কুট, কলা কিনে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দেন। পৌঁছে দিয়ে বলেন, ছিঃ, মতলব! চুরি করা কি তোমার সাজে! অন্য অনেক কাজ আছে। আমি একটা ভ্যান কিনে দেবো তোমাকে, বুঝলে! তবে ওয়াদা করতে হবে জীবনে আর চুরি করবে না। এক মাস লেগেছিল ওর সেরে

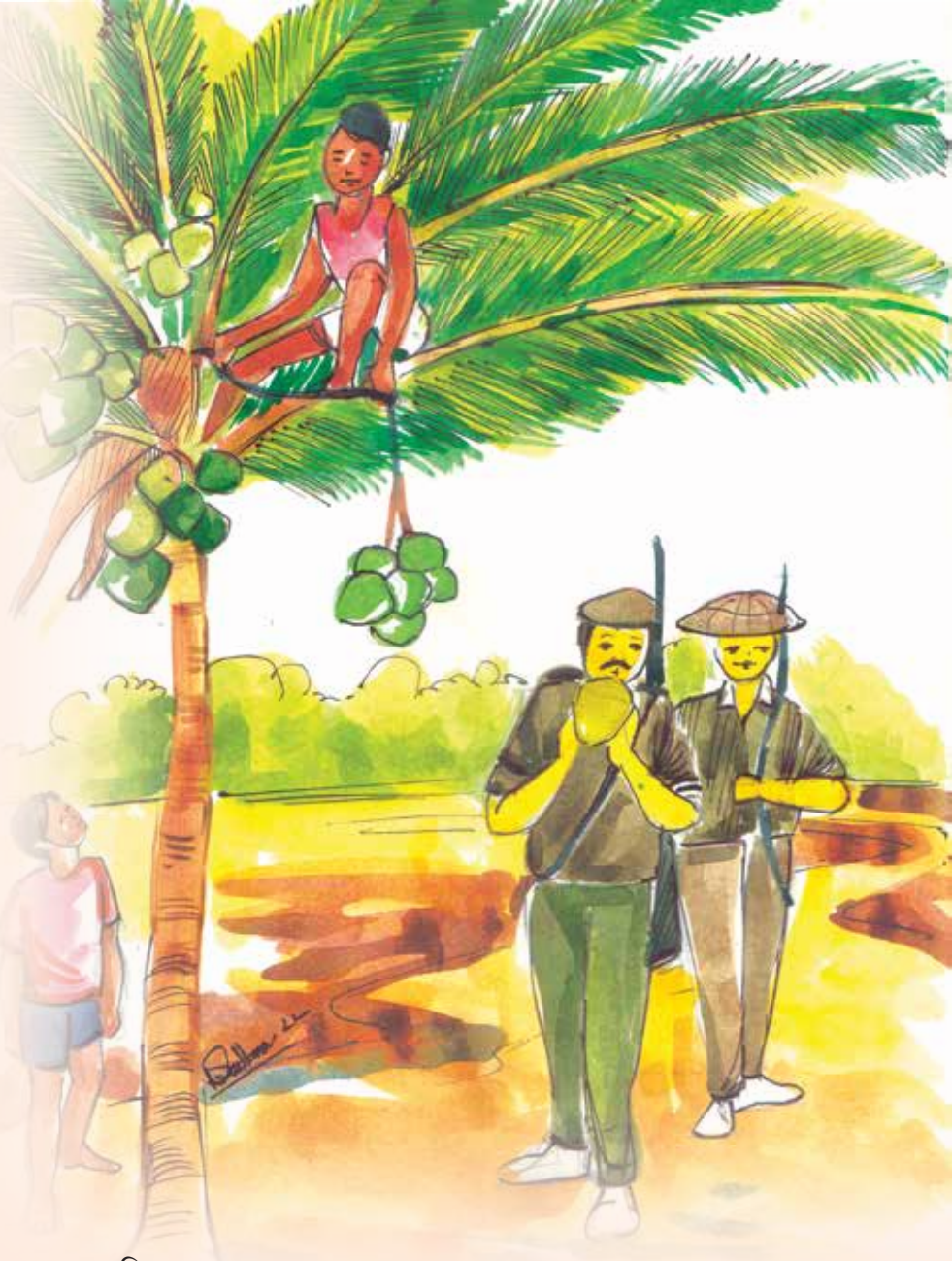

উঠতে। পরে বাবলুর আব্বা কথা রেখেছিলেন। মতলবকে একটা ভ্যানগাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। এরপর সে আর চুরি করেছে কিনা কেউ জানে না।

তো বাবলুকে দেখে রাজাকার মতলব চোরা হেসে মাথায় আদর বুলিয়ে বলল, কেমন আছেন ছোটো ভাই? চাচা কি বাড়িতে আছেন? বাবলু খুব বুদ্ধি করে। বলল, আমার বুবুর অসুখ, তাই টাঙ্গাইলে গেছেন তাকে দেখতে। মতলব প্রশ্ন করল, তা ফিরবেন কবে? বাবলু সঙ্গে সঙ্গে বলল, দেরি হবে, বুবুর কঠিন অসুখ, আব্বা তাকে বড়ো ডাক্তার দেখায়ে সুস্থ হলে তবে ফিরবে।

মিথ্যা কথা বলতে নেই জানে বাবলু। তবে এই বিপদের সময় তো আসল কথা বলা যায় না। মুরাদ সাহেবও তো গেছেন মুক্তিযুদ্ধে। তবে, টাঙ্গাইলে গিয়ে অসুস্থ মেয়েকে দেখে ওপারে গেছেন ট্রেনিং নিতে।

বাবলুর সঙ্গে মতলবের কথা বলা দেখে মোঁচুয়া হানাদারটা কর্কশ স্বরে বলল, আবে মতলব রাজাকার.. ও-লাড়কা কৌন হ্যায়?

মতলব হেসে বলল, হামরা চাচাকা বাচ্চা, মানে, ছোটো ভাই। বহুত আচ্ছা লাড়কা। দেখিয়ে না আপলোক ডাব খায়েগা জানকে দাও আর বি রজ্জু লেকে আয়া। ইয়ে গাছ বি ইসলোকোকা।

খান সেনারা শুনে বেশ খুশি হলো। মোঁচুয়াটা বলল, বহুত আচ্ছা! এই বলে সে রাজাকার মতলবের দিকে তাকিয়ে বলল, ইসকো ক্যাম্পমে লে যায়েগা। রোটি আওর বকরিকা গোস্ত খিলায়েগা।

মতলব, মাথা দুলিয়ে বলল, ঠিক হ্যায় মেজর সাহাব।

বাবলু বুঝে গেল এ ব্যাটা পাকহানাদারদের মেজর। তার কথায় সে খুশি হলো। তাহলে তো ওদের হাঁড়ির খবর বাবলুর জানা হবে। এই ভেবে সে মেজর সাহেবকে বড়ো করে একটা স্যালুট দিলো। মেজর

ওর ভদ্রতা দেখে খুশি হয়ে পকেট থেকে একটা কাঠি লজেন্স বের করে দিলেন। মতলবও বাবলুর ভদ্রতা দেখে খুশি। মেজরের দিকে তাকিয়ে বলল, বহুত শরীফ আদমিকা লাড়কা হ্যায় স্যার। মেজর হেসে বলল, হাঁ, হাঁ... বহুত আচ্ছা লাড়কা!

এক রাজাকার বাবলুর হাত থেকে দা আর দড়িগোছা নিয়ে তরতর করে গাছে উঠে গেল। সে দু'ছড়া ডাব কেটে দড়িতে বেঁধে নিচে ফেলল। রাজাকাররা কেটে কেটে হানাদারদের দেয়। তারা ঢকঢক করে গিলতে থাকে। এক একজন দুতিনটা করে খেলো। খেয়ে ঢেঁকুর তুলে বাবলুর দিকে তাকিয়ে গুঁফো হাসি হেসে বলল, বহুত আচ্ছা পানি। বাবলু মৃদু হেসে ওদের প্রশংসার জবাব দিলো।

এরমধ্যে মতলব রাজাকারের সঙ্গে আরো ভাব করে ফেলল বাবলু। তার কাছ থেকে আধা আধা চলার মতো কিছু উর্দু কথাও শিখে নিলো। মাঝে মাঝে হানাদারদের ক্যাম্পেও যায় মতলবের সঙ্গে। বাবলু প্রথমত ছোটো ছেলে, তার ওপর হানাদাররা মাঝে মাঝে ওকে দোকানে পাঠায় এটা-ওটা আনতে। এভাবে সে অল্পদিনেই হানাদারদের কাছে বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছে।

ওদের ধারণা বাবলু ওদের কথাবার্তা বোঝে না, বুঝলেও ক্ষতি নেই, সে ওদের পক্ষেরই। অনেক যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং গোপন তথ্য পরস্পরের মধ্যে ওরা আলোচনা করে। বাবলু যেন ওসব কিছুই শোনেনি এমন ভাব করে থাকে। কিন্তু বাবলু সবই শুনে মনের মধ্যে রেখে দেয়। এদিকে বাবলুর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদেরও যোগাযোগ হয়ে গেছে। বাবলুর আব্বা প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আসেন। তিনি একটা গ্রুপের কমান্ডার। যোগাযোগ রাখতে হয় আশপাশের ক্যাম্পের মুক্তিফৌজদের সঙ্গে। বাবলুর আব্বাই ওই ক্যাম্পের ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধাদের বাবলুদের খবরাখবর জানাতে পারেন। সেই সুবাদে বাবলুর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

বাবলু ওদের বড়ো মাধ্যম এখন। হানাদারদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং যুদ্ধকৌশল ও অবস্থান জরুরিভাবে মুক্তিদের আগেভাগে জানিয়ে দেয়। ফলে, মুক্তিযোদ্ধারা তিনটি সফল অপারেশন চালিয়েছে। তাতে কয়েক ডজন হানাদার মারা পড়েছে, তাদের ফেলে যাওয়া যুদ্ধাস্ত্রও মুক্তিসেনাদের হস্তগত হয়েছে। সর্বশেষ অপারেশনটা ছিল মাধবপুরে। এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বড়ো ধরনের ক্ষতি হয়েছে। রাতের অন্ধকারে মুক্তিদের পুঁতে রাখা মাইনে তিনটি সাঁজোয়া যান বিধ্বস্ত হয়েছে। তাতে প্রায় ৩৬ জন পাকসেনা নিমিষেই শেষ। এ ঘটনার পর সদরের হানাদাররা সজাগ হয়ে উঠেছে। তারা ভেবে পায় না তাদের গোপন মিশনের খবর আগেভাগে মুক্তিরা কীভাবে পায়? সন্দেহের তীর প্রথমত বিঁধে রাজাকারদের দিকে। তারা এই সন্দেহে ৫ জন বিশ্বস্ত রাজাকারকে ক্যাম্পে ডেকে এনে নির্বিচারে হত্যা করে।

বাবলু আজ সকাল সকাল সদরের হানাদার ক্যাম্পে যায়। মুক্তিযোদ্ধা সবুজ ভাই ওকে বলেছেন, কাল একটা অপারেশন হবে। তাই ওদের মতিগতিটা জেনে জানাতে হবে। একটা উছিলা নিয়ে যেতে হবে তো। তাই এক থলে পাকা বরই নিয়ে হাজির হয়। এদিন কয়েকজন হানাদার তার দিকে শত্রুর চোখে তাকায়। বরইয়ের থলেটা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বাবলু মৃদু হাসে। একজন থলেটা খুলে বলল, বহুত আচ্ছা লাড়কা। কিন্তু আর একজন মোঁচুয়া ওকে ডাকল, ডেকে রীতিমতো জেরা করা শুরু করে। বলে, তুম মুক্তিলোককো চিনতা হ্যায়? বাবলু যেন কিছুই বোঝে না.. এমন ভান করে উলটো প্রশ্ন করে, মুক্তি? মুক্তি কিয়া হ্যায়? গরু, নাকি বকরি? হানাদারটা আর কিছু না বলে রাইফেল পরিষ্কার করতে থাকল।

এর মধ্যে বাবলু শোনে তাদের কয়েকজন বলাবলি করছে আজ একটা বড়ো অপারেশন হবে। মাধবপুরে মুক্তিরা ক্যাম্প করেছে। রাতে নয়, দুপুরেই অপারেশন চালাতে হবে। ওরা খবর পেয়েছে ওখানে ২০০ মুক্তিফৌজ এসে জড়ো হয়েছে। দুপুরে ওদের কমান্ডার আসবে সেই ক্যাম্পে। ওরা দুপুর আড়াইটায় গোপন মিটিংয়ে বসবে মাধবপুর কাজলা বিলের মাঝখানের চরে। চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেলে শেষ করতে হবে।

শুনে বাবলুর অন্তর কেঁপে উঠল। সে জানে তার আব্বা মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার। আর যদি ঘটনাটা সত্যি হয় তাহলে তো মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে।

বাবলুর মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। সে আর কালক্ষেপণ করতে চায় না। হানাদাররা নিজেদের মধ্যে আলাপে মত্ত হয়ে উঠলে আস্তে আস্তে ক্যাম্প থেকে বের হয়। ক্যাম্পটা চোখের আড়াল হলেই সে দৌড়াতে থাকে নাভিশ্বাসে।

সে ছুটতে ছুটতে নদীর ঘাটে এসে হাঁফাতে থাকে। ঘাট পার হয়ে তিন মাইল দূরে মাধবপুর। তাহলে কী হবে এখন? ভাবতেই সে মাথায় কার হাতের স্পর্শ টের পায়। কেমন আঁতকে ওঠে। তাকাতেই দেখে মুক্তিযোদ্ধা সবুজ ভাই। খালি গায়ে, মাথায় একটা তরকারির ঝুড়ি। ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধা। বাবলুর মনে আশার সঞ্চার হয়। সে বলল, সবুজ ভাই...! তারপর কানের কাছে সব ঘটনা খুলে বলল। শুনে, সবুজ ভাই বলল, বাবলু হাতে সময় নেই। তুমি বাড়িতে যাও। সাবধানে থেকো। আমাকে এখনই সব ব্যবস্থা করতে হবে। বাবলু প্রশ্নের সুরে বলল, সবুজ ভাই, আমিও যুদ্ধে যাব। আমাকে নাও না!

সবুজের কানে তার কথা পৌঁছালো না। সে ততক্ষণে সাঁতরে নদীর মাঝখানে প্রায়।

বাবলু বাড়িতে ফিরে ভাবতে থাকে আজ তাকেও কিছু করতে হবে। কিন্তু কী করবে সে! হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। কী বুদ্ধি তা কারো কাছে ফাঁস করল না।

দুপুর তিনটা হয়ত হবে তখন। বাবলু শুনতে পায় প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ। তিন মাইল দূরের যুদ্ধ। নীরব নিস্তব্ধ দুপুরে দূরের শব্দও বাতাসে আছড়ে এসে পড়ছে। বাবলু কল্পনা করে প্রতিটা শব্দে যেন একঝাঁক হানাদার খতম হচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। ততক্ষণে গোলাগুলি থেমে গেছে। বাবলু নদীর ঘাটে একটা ফাঁকা ছইখোলা নৌকায় বসে আছে কিছু একটা করার মতলবে। কী করবে বাবলু?

সন্ধ্যার ধূসর প্রকৃতি আরো আঁধার হয়ে আসছে। চারদিক ছিমছাম নিস্তব্ধতা। হঠাৎ ওপার থেকে চিৎকার ভেসে আছে। ইয়ে কিস্তি ইধার লে আও। হামলোক মর যায়েগা.. জলদি আও..। বোধহয় ওই ডাকের অপেক্ষাতেই ছিল বাবলু।

সে কালবিলম্ব না করে ঘন ঘন বৈঠা নেড়ে নৌকাটা ওপারে নিয়ে যেতে থাকল। পীঠটান দেওয়া আহত হানাদাররা তখনও চিৎকার করছে। বাবলু ঘাটে নৌকা ভিড়াতেই ৬জন রক্তাক্ত হানাদার লাফ দিয়ে নৌকায় চড়েই বলল, জলদি টানো। বাবলু ওদের দেখে চিনতে পারল। সকালে যে হানাদারটা ওকে জেরা করেছিল সেও আছে।

বাবলু জিজ্ঞেস করল, কেয়া হুয়া আপলোককা। ওর কথায় একজন কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, সবকুছ খতম হামলোককা। মুক্তিলোক খতম করদিয়া মেজর সাব, ক্যাপ্টেন সাব আউর একসো সিপাই আদমিকো। হামলোক মরকে-মরকে ভাগা।

আঁধারে মুখ ঘুরিয়ে মৃদু হাসল বাবলু। ওরা আবার চেঁচিয়ে বলল, টানো.. জলদি টানো।

তখন মাঝনদীতে নৌকাটা। বাবলু বলল, হ টানতেছি। শেষ টানা টানতেছি.. এই বলেই সে লাফ দিলো নৌকা থেকে। হানাদাররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিকট শব্দে নৌকাটা চুরমার হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে হানাদার ৬জনও শেষ।

বাবলু পাড়ে উঠে জয় বাংলা বলে ছুটল বাড়ির দিকে। ওদিকে ওপারেও জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। হাজার হাজার কণ্ঠ। বাড়িতে ফিরতেই দেখে এপারের আকাশ -বাতাসও জয় বাংলা ধ্বনিতে তোলপাড় হয়ে উঠেছে। ক্রমশ সেই ধ্বনি বাবলুদের বাড়ির কাছে চলে আসছে। তারপর শত শত গ্রামবাসী ছুটতে থাকল সদরের দিকে। সবার কণ্ঠেই জয় বাংলা ধ্বনি। বাবলু বুঝতে পারল মুক্তিযোদ্ধারা থানাসদর ছুটে আসছে। ওদের বাড়ির রাস্তা দিয়েও অনেকে ছুটছে। কারো কারো হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা। গ্রামের ইনসান দাদা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাবলুদের বাড়ির দরোজায় হাঁক ছাড়তে লাগলেন, কই গেলিরে তোরা? দেশ আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে গেছে। আজ ১৬ই ডিসেম্বর না! আজ আমাদের বিজয়ের দিন।

বাবলুর মা দৌড়ে এসে আনন্দে কী করবেন বুঝতে পারলেন না। বললেন, চাচা বাবলুকে তো দেখি না।

দেখবেন কী করে, বাবলু যে তখন থানাসদরের দিকে ছুটছে...। হাজারো মুক্তিযোদ্ধার ভিড়ে বাবলুও মিশে যাবে। ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধা না বাবলু সত্যিকারের বীর মুক্তিযোদ্ধা। ■

গল্পকার

মা আমি যুদ্ধে যাব

দিলরুবা নীলা

অনুর ছোটো ভাই অপু হঠাৎ এমন নিশ্চুপ হয়ে গেল কেউ বুঝতে পারল না। অনু কেন ওদের বোন শিউলি, পাড়াপড়শি সবাই খুব অবাক অথচ এই কয়েক বছর আগেও সে কত হাসিখুশি ছিল। লেখাপড়ায়, খেলাধুলায় সব দিকে সবার চেয়ে এগিয়ে, অথচ এখন! সে কারো সাথে কথাই বলে না চুপচাপ থাকে। লেখাপড়া করে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে কাউকে যেতে দেখলেই তার পিছন পিছন চলে যায়, সন্ধ্যায় আর তাকে পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে তাকে বের করে আনতে হয় অনু মায়ের কাছে অপু সম্পর্কে জানতে চাইলে মাও কিছু বলে না। তবে অনু ঠিকঠাক বুঝতে পারে মা হয়ত কিছু জানেন। কিন্তু মা কিছুতেই মুখ খোলেন না।

রাতে মা অপুর কাছে ঘুমান। তিনি অপুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন আর আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছেন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই কাহিনি। সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত। তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন অপু আর অনুর পাশে। ভোর রাতে ঘুম ভেঙে তিনি বিছানায় অপুকে দেখতে পান না। পাশের রুম, ওয়াসরুম সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায় না।

অজানা আশঙ্কায় অপুর মায়ের মন দুরুদুরু করতে থাকে। অপুর বাবাকে ডাকতে যাবেন এমন সময় দরজা ঠেলে অপু ঘরে ঢোকে।

ঃ অপু এদিকে আয়। অপুকে টেনে মা বারান্দায় নিয়ে আসে। পাছে বাসার সবার ঘুম ভেঙে যায়।

ঃ বল, কোথায় গিয়েছিলি এত রাতে?
ঃ মা কোথাও যাইনি।
ঃ আবার মিথ্যা বলে, বল কোথায় গিয়েছিলি?
ঃ মা প্লিজ, এ বিষয়ে আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।
ঃ ঢং করিস না, বল।
ঃ মা আমি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলব। আমি বলতে পারব না।
ঃ আমি তোর মা। আমাকে বল, আমি আর কারো কাছে বলব না। অপু বাধ্য হয়ে বলতে থাকে।
ঃ মা আমি গত কয়েকদিন ধরে স্বপ্নে দেখছি আমাদের পুকুর পাড়ের নারকেল গাছের পেছনে মাটির নিচে একটা ঘড়া আছে। সে ঘড়া ভর্তি সোনার মোহর এবং সেটা আনতে পারলেই আমার হয়ে যাবে।
ঃ ভালো কথা সেটা আনতে এত রাতে তোমাকে একা যেতে হবে?
ঃ না মা। সেটার কথা কাউকে বলা নিষেধ। আমি কাউকে বললে সেটা আর আমি পাব না।
ঃ না পেলে না পাবি। আমাদের ওসব সোনার ঘড়া লাগবে না। এখন ঘুমা গিয়ে, কাল সকালে তোর বাবাকে নিয়ে দেখবি কী আছে ওখানে।
ঃ মা, আমি ওটা নিয়ে এসেছি।
ঃ মানে? কোথায়?
ঃ ওই যে ওই চৌকির নিচে, অপু বারান্দার পূর্ব পাশে রাখা চৌকির নিচে আঙুল দিয়ে দেখায়। মা গিয়ে চৌকির নিচে উঁকি দেন। কিন্তু কোথাও কিছু খুঁজে পান না।
ঃ কই কোথাও তো কিছু নেই।
ঃ নেই মানে? এখানেই তো রেখেছিলাম। কই গেল মা? মা কই গেল আমার সোনার ঘড়া?
ঃ বাদ দে ওসব। ওগুলো তোর মনের ভুল। চল ঘুমাতে চল। কাল সকালে খুঁজে দেখব কোথায় কী আছে।
হঠাৎ করে অপু আর কিছু বলে না লক্ষ্মী ছেলের মতো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। এরপর থেকে অপু আর কোনোদিন কথা বলেনি।
এসব ভাবতে ভাবতে অপুর মা কখন ঘুমিয়ে পড়েন, টের পান না। কিছুদিন যাবৎ দেশের পরিস্থিতি ভালো না, ঢাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ আলোচনা। অনুদের বাড়িতেও সেসব আলোচনা শোনা যায়। অনুর বাবা নিরীহ মানুষ, যুদ্ধ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। তিনবেলা পেট ভরে ভাত আর ঘুমের জন্য নিশ্চিত বিছানা তাতেই খুশি। ছোটোখাটো ব্যাবসা করেন। দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন তার। কেন যে সবাই যুদ্ধের জন্য খ্যাপেছে তিনি বুঝতে পারেন না।
ঃ অনু বেশি বাইরে যেও না। দু'তিনজন বন্ধু বান্ধব এক সাথে কোথাও গল্প করো না। দিনকাল ভালো না।
ঃ ঠিক আছে বাবা।
অনু বাবাকে বলল সে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয় না। ঘটনা পুরোপুরি সত্য নয়, তারা আড্ডা দেয় না ঠিক আছে তবে তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। তারা মুক্তিযুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
অনু এবার ক্লাস নাইনে, অপু অনুর চেয়ে এক বছরের ছোটো, ইদানীং অপু অনুর পিছন ছাড়ছে না। অনু যেখানে যাবে সেও পিছনে পিছনে যায়। বন্ধুদের সাথে আলোচনার সময়ও পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। যদিও অপুকে ওরা ভয় পায় না কারণ অপু কোনো কথাই বলে না। তাই বাবাকে বলে দেবে না এটা নিশ্চিত। অনুর বন্ধুরা পাড়ার বড়ো ভাই রিপনের সাথে কথা বলে ঠিক করে যে, আগামীকাল রাতেই তারা যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে যাবে। পরদিন রাতে চুপি চুপি অনু যখন দরজা খুলে বেড়িয়ে যাবে তখন অপু পিছন থেকে ওর হাত ধরে।
ঃ কীরে হাত ছাড়। আমাকে যেতে হবে। অপু হাত ছাড়ে না। অনু জোর করে ওর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই অপু হঠাৎ করে কথা বলে ওঠে।
ঃ ভাইয়া আমিও যুদ্ধে যাব। অপুর কথা শুনে অনু চিৎকার করে ওঠে।
ঃ মা দেখো অপু কথা বলছে। বাবা, মা, শিউলি সবাই অনুর চিৎকারে দৌড়ে চলে আসে।
ঃ কী হয়েছে অনু।
ঃ মা, অপু কথা বলছে। বল অপু, মাকে শোনা তোর কথা।
ঃ মা, আমি যুদ্ধে যাব। প্রায় আড়াই বছর পরে ছেলের মুখে কথা শুনে মা চোখের পানি আটকে রাখতে পারেন না।
ঃ আমি আর তোকে কোনো কাজে বাধা দেবো না বাবা, তুই যুদ্ধে যা। অপু ওর ভাই অনুর হাত ধরে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। অপু যদি একবারের জন্য পিছন দিকে ফিরত তাহলে দেখতে পেত, তার চিরকালের শান্তিপ্রিয় বাবা-মা তারা যুদ্ধে যাচ্ছে এই ভেবে মোটেও বিরক্ত নন। বরং তাদের চোখে গর্বিত পিতামাতা হবার অহংকার জ্বলজ্বল করছে। ■

গল্পকার

● মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস ধারাবাহিক

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর দ্বাদশ পর্ব-প্রথম অংশ]

অপারেশন ইন্দ্রা

থানা সদরে সফল অপারেশনের পর আমাদের মনোবল যেমন হাজারগুণ বেড়ে যায়, তেমনি হানাদার বাহিনী আর রাজাকারেরাও যেন খ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে যায়। তারা থানা সদরে রাজাকারের সংখ্যা বাড়িয়েছে কয়েকগুণ। শহর থেকে আর্মিদের একটি দলও এসে আস্তানা গেড়েছে ক্যাম্পে। তবে তারা তেমন বাইরে যাচ্ছে না। বাইরে মানুষের বাড়িঘর লুটের পর আগুন লাগানোর কাজ তারাই করছে। আর্মিরা বলেছে– জয় বাংলাওয়ালাদের বাড়িঘর লুট করো যত পারো। আগুন লাগাও বাড়িঘরে। ওসব খতরনাক ছোটোলোকের কাজ তোমরা করো। আমরা করব বড়ো কাজ। বড়োসড়ো অপারেশন হলেই আমরা যাব; আর এখন গরু-খাশির গোস্ত খাব, কিছু পানও করব। কোনো ভয় পেয়ো না মুজাহিদ ভাইয়েরা। আমরা তোমাদের সাথে আছি। মুক্তিদের কোনোদিন আর এই ক্যাম্প আক্রমণের সাহস হবে না। আশেপাশেও আসবে না জাদুরা।

থানা সদরের রাজাকারদের এই শক্তিবৃদ্ধি আর মানুষজনের বাড়িতে লুটপাট-অত্যাচার বৃদ্ধির ঘটনায় আমরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ি। জমির ভাইও এ নিয়ে খুব ভাবছেন, আমার সাথে আলোচনাও করছেন। আমি স্থানীয় বলে আমাকেই উনি বারবার তাগাদা দিচ্ছেন একটা কৌশল বের করার জন্য। কারণ, এখন কোনোভাবেই আর থানা সদরের রাজাকার ক্যাম্পে সরাসরি আক্রমণ করা যাবে না। আগেরবার যেসব দুর্বলতার সুযোগে আমরা ক্যাম্প আক্রমণ

করেছিলাম ছাত্রী ব্রিগেডের সাহায্যে, এখন সেসব দুর্বলতা সবই কাটিয়ে উঠেছে ওরা। তাই অন্য কৌশল অবলম্বনের চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে উঠি।

অবশেষে কৌশল একটা ধরা দিল। আমার সেই কৌশলের নাম বুলু– বুলু কাঠুরিয়া। তাকে কাজে লাগিয়েই সেই কৌশল বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখছি আমি। সেই কৌশলের জাল বেশ বিস্তৃত আর ঘোরানো প্যাঁচানো হলেও আমার বিশ্বাস– এই নতুন কৌশলের মাধ্যমেই এবারের সমাধান আসবে। এখন এসো সেই কাহিনি বলি।

কাঠ কেটে লাকড়ি বানানোই বুলুর পেশা। তাই নাম হয়েছে বুলু কাঠুরিয়া– পুরো নাম বজলুর রহমান। কাঠ কাটাই তার জীবিকার একমাত্র পথ। তার বিশাল ধারালো কুড়ালের কোপে বড়ো বড়ো গাছ হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ে। গাছগুলো যখন ডালপালাসহ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে, তখন বুলুর মনটা ব্যথায় টন টন করে ওঠে। গাছের সবুজ-সতেজ পাতাগুলো যেন ওর দিকে করুণ-চোখে তাকায়। বুলুর মনে হয়, পাতাগুলো যেন ওকে বলতে চায়–তুমি অত নিষ্ঠুর কেন! তুমি আমাদের এভাবে খুন করো কেন! বুলুও যেন মাঝে মাঝে ওদের এসব কথা বুঝতে পারে। তাই আপন মনে বিড়বিড় করে ওদের উদ্দেশে বলে– আমি ইচ্ছে করে কী আর তুমাগের কাটি! গাছ না কাটলি পেট চলবি কী করে! বুড়ো বাপ-মাকে খাওয়াবো কী! গাছ কা'টে খড়ি বানাই। তারপর টাহা পাই। সেই টাহা দিয়ে চাল-ডাল, তেল-নুন কিনি। তুমাগের জীবন যায়, আর সে-জন্যি আমাগের জীবন বাঁচে। তবে বিশ্বাস করো, তুমাগের কাটতি আমার খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু আমি তো প্যাটের দায়েই এ কাজ করি, কী করব বলো! .....

তবে এভাবে বেশিক্ষণ ভাবার সময় পায় না বুলু কাঠুরিয়া। আজ ঘরে খাওয়ার কিচ্ছু নেই। তাড়াতাড়ি গাছটা কেটে সন্ধ্যের আগেই লাকড়ি বানানো শেষ করতে হবে। তারপর মিয়াজির কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজার সদাই করতে হবে। এসব কথা ভেবে আরো জোরে কুড়াল চালায় বুলু। চেরা-কাঠের ফালি থেকে একধরনের মিষ্টি গন্ধ বের হয়। বেশ লাগে। গাছের পাতাদের আহাজারি সে তখন আর শুনতে পায় না।

কাঠ চেরাই শেষ করতে করতে সন্ধে ঘনিয়ে আসে। চারদিকে কে যেন চমৎকার অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে নিঃশব্দে। বুলু খড়িগুলো একটু গুছিয়ে রেখে মিয়াজির বাড়ির দিকে কয়েক কদম এগিয়েছে। কাঁধে বিশাল ধারালো কুড়ালটি। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাক দেয়: বুলু, দাঁড়া। জরুরি কথা আছে।

বুলু ফিরে তাকায়। বলে–ওঃ, সাদেক ভাই নাকি? তা, খবর কী ভাইজান?

সাদেক ভাইদের বাড়ি পাশের রামকান্তপুর গ্রামে, বুলুদের বাড়ি থেকে অল্প দূরে– মাঝে মাত্র একটা ছোট্ট খাল। সাদেক ভাই বয়সে বুলুর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়ো, আমার চেয়েও বড়ো– এখন আই. এ ক্লাসের ছাত্র। প্রাইমারিতে বুলু আর সাদেক ভাই একই স্কুলে পড়ত– তবে বুলুর চেয়ে সাদেক ভই ওপরের ক্লাসে। প্রাইমারি পড়া শেষ হলে টাকার অভাবে বুলুর আর পড়া হয়নি, বাবার সাথে কাজে নামতে বাধ্য হয়।

বুলুর বাবা রইসউদ্দিন পরের বাড়িতে কিষেণ দিতো, বুলুও তার সাথে লেগে গেলো। ছোটো মানুষ বলে ওর মজুরি কম। তারপরও কোনো রকমে চলছিল। কিন্তু বুলুর বয়স যখন তেরো, তখন ওর বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ডান পা-টা পুরো অবশ হয়ে গেল। থানা সদরের ডাক্তার বলেছিলেন ওটা নাকি হার্ট অ্যাটাকের জন্য হয়, যার নাম স্ট্রোক। বুলুরা আগে এ রোগের নামও শোনেনি কোনোদিন।

অসুস্থ হওয়ার পর থেকে বাবার কাজকর্ম বন্ধ। বুলু একা কিষেণ দিয়ে যা পায়, তাতে সংসারই চলে না। এদিকে বাবা অসুস্থ, তার ওষুধ-পথ্যের দরকার। চারদিকে অন্ধকার দেখতে থাকে সে। তারপরই কীভাবে কীভাবে যেন ও কাঠ চেরাইয়ের পেশায় এসে পড়ে। শরীরটাও এরি মধ্যে তাগড়াই হয়ে গেছে– পনেরো বছরের বুলুকে মনে হয় পঁচিশ বছরের। সে গায়ের শক্তিতে কুড়াল চালায়। বড়ো বড়ো গাছ কেটে জ্বালানিকাঠ চেরাই করে। এতে যা আয় হয়, তা মন্দ না। বেশ ভালোভাবেই চলছিল ওদের দিনকাল।

সাদেকের ডাক শুনে বুলু একটু ভড়কে যায়। তার কথার মধ্যে একটু বিপদের গন্ধ টের পায় বুলু। সাদেককে ও বড়ো ভাইয়ের মতোই জানে। মানে। তাই আবার জিজ্ঞেস করে– সাদেক ভাই, কী ব্যাপার, কওদিনি?

সাদেক তখন ফিস ফিস করে বলে– বুলু, ওইদিকে মাঠের মধ্যে চল। জরুরি কথা আছে–বলে বুলুর হাত ধরে টানতে টানতে ইশকুলের পাশের ছোটো মাঠের এক কোনায় নিয়ে যায়। তারপর বলে: বুলু, কিছু শুনেছিস?

–কী? কী শোনাব? কওদিনি ভাইজান? কোনো খারাপ কিছু?– ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করে বুলু।

সাদেক উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চাপাগলায় বলে– সামনে খুব বিপদ রে বুলু!

–ক্যানো! কী বিপদ? সব খুলে কও তো! আমার বুকির মদ্যি ঢিব ঢিব কত্তেছে একদম।

সাদেক বলে– দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা কি তুই জানিস?

বুলু আমতা আমতা ক'রে বলে: হ্যাঁ, গোলমাল শুরু হয়ছে শুনিছি। তা ভালো করে জানিনে ভাই। সারাদিন কাঠ কা'টে হয়রান থাহি। তো, ওসব খবর রাখব কহন? তা তুমি খুলে কওদিনি.. ..

সাদেকের গলা হঠাৎ একটু কঠিন শোনায়, বলে: গোলমাল না, বুলু– মুক্তিযুদ্ধ! সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। খান সেনাদের সাথে মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে। ওরা খান ব্যাটাদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেশটাকে স্বাধীন করবে।

বুলুর মুখটা ভয়ে শুকিয়ে যায়। বলে: কও কি, ভাইজান! শুনিছি, পাকিস্তানের সৈন্যরা না কি খুবই মারাত্মক? ওগের সাথে যুদ্ধে না কি কেউ পারে না?

–আরে, রাখ তো বুলু! বাংলাদেশের বিচ্ছুদের তো চেনে না খান ব্যাটারা! একেবারে পদ্মা-মেঘনা-মধুমতির ঘোলা পানি খাইয়ে মারবে দেখবি। তা, খবর আরও একটা আছে বুলু। থানা সদরে রাজাকাররা ক্যাম্প করেছে। ওরা না কি...

সাদেকের কথা শেষ না হতেই বুলু জিজ্ঞেস করে: রাজাকার! সে আবার কী ভাইজান? এ নাম তো কোনোদিন শুনিনি?

বুলুর সরলতায় সাদেকের হাসি পায়। কিন্তু হাসে না। বলে– বুলু, রাজাকার হলো খান সেনাদের সাহায্যকারী বাহিনী। ওরা গ্রাম-গঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আবার এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলাও না কি ঠিক রাখবে। তবে ওদের আসল কাজ হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের বেছে বেছে হত্যা করা, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, সহায়-সম্পদ লুট করা। তবে সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানিস? সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, রাজাকার বাহিনীর সবাই বাঙালি। বাঙালিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদেরই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানিরা। আর আমাদের মাঝেরই কিছু লোক পাকিস্তানি হানাদারদের সাহায্য করার জন্য দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে! স্থানীয় মুসলিম লীগ আর জামাতে ইসলামীর নেতারাই এই বাহিনী গঠন করেছে, তবে জামাতের লোকেরাই বেশি। বুলু, এ সময় আমাদের কিছু-একটা করা দরকার ? দেশের শত্রু ওই মিরজাফরদের ঠেকাতে হবে?

বুলুর মাথা ঘুরতে থাকে সাদেকের কথা শুনে। সারাদিনের কাঠ কাটার ক্লান্তি হঠাৎ যেন ও ভুলে যায়। মিয়াজির কাছ থেকে টাকা নেয়া, বাজার সদাই নিয়ে বাড়ি যাওয়া– এসব কথাও ওর আর মনে থাকে না। দেশের মানুষের সামনে যে এখন ভয়ংকর বিপদ, এ কথা ভালোভাবেই বুঝতে পারে বুলু। কিন্তু এখন ওদের কী করা দরকার, তা ওর মাথায় আসে না। তাই সাদেকের হাত ধরে বলে: ভাইজান, তুমি লেহাপড়া জানা বিদ্বান মানুষ। আমি তুমারে সবসময় নিজের বড়ো ভাইয়ের মতোই মনে করি। ভাই, এহন তুমিই কওদিনি আমাগের কী করা দরকার!

সাদেক হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলে: বুলু! তুই তাড়াতাড়ি বাজার করে বাড়ি যা। তোর কাছে নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা নেই? এই নে টাকা। শিগ্‌গির বাজারে যা। খুব তাড়াতাড়ি সদাই করে আন। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর এক জায়গায় যেতে হবে।

সেখানেই সব জানতে পারবি।

বুলু কী যেন বলতে যায়। সাদেক বাধা দিয়ে বলে– তোর কাঠ চেরাইয়ের টাকা পরে নিস। এখন সময় কম। শিগগির যা বললাম তাই কর। –বলে বুলুর হাতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দেয় সাদেক। তারপর বুলুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মাঠের উলটো দিকে যেতে যেতে বলে– তুই খেয়েদেয়ে রেডি হয়ে থাকবি। আমি ঘণ্টা-তিনেক পরে এসে তোকে নিয়ে যাবো।

সাদেক চলে যাওয়ার পর বুলুর যেন হুঁশ ফিরে আসে। ও তাড়াতাড়ি মসজিদের কাছে বটতলায় সিরাজ আলির দোকানটায় যায়। ওখান থেকে চাল, ডাল, আলুসহ অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র কিনে নিয়ে দ্রুত বাড়ি চলে যায়। এখন বড়ো বাজারে গিয়ে মাছ-তরকারি কেনার সময় নেই। সাদেক ভাই আসার আগেই ওকে রেডি হয়ে থাকতে হবে। ওর কেবলই মনে হতে থাকে– সাদেক ভাই ওকে আজ নিশ্চয়ই দারুণ কোনো জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় নিয়ে যেতে পারে, সে-সম্পর্কে পষ্ট কোনো ধারণা তার মাথায় আসে না।

রাত দশটার দিকে সাদেক আসে বুলুদের বাড়ি। বুলুর বাবা-মা খেয়েদেয়ে বেশ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। গ্রামে এরই মধ্যে যেন গভীর রাত। চারদিকে সুনসান নীরবতা। বুলুও খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সাদেকের অপেক্ষায়। বুলুকে দেখেই সাদেক ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে।

বুলুদের বাড়ির পশ্চিম দিকে একটা বিশাল বিল। এর নাম বিল জলেশ্বর। আগে এই বিলে সারাবছর পানি থৈ থৈ করত। এখন শুধু বর্ষাকালে পানি থাকে, গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। বিলজুড়ে তখন ধানের চাষ হয়। কিন্তু রাতে এই বিশাল বিলের দৃশ্য হয় অন্যরকম। দূর থেকে দু'-একটা 'ভূতের আলো' ছাড়া সেখানে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। জমাটবাঁধা কালোর সমুদ্র যেন। দেখলে গা ছমছম করে ওঠে।

তো, সাদেক বুলুকে নিয়ে সেই বিল জলেশ্বরের দিকে হাঁটা শুরু করে। বিল জলেশ্বর বুলুদের গ্রামের পাশে হলেও রাতে কোনোদিন ও-মুখো হওয়ার সাহস করেনি সে। গ্রামের মুরব্বিরা বলেন– বিলের মধ্যে চান্দারকুঁড় নামক স্থানে একটা ঢিবির ওপর যে বড়ো বরই গাছটা আছে, তার তলায় গভীর রাতে ভূতেরা মিটিং করে। নাচ-গানও নাকি করে। সে-সময় নাকি

সেখানে রং-বেরঙের আলোও দেখা যায়। বুলু এসব নিজের চোখে কোনোদিন দেখেনি; ভূতদের গানও সে কোনোদিন শোনেনি। সব শোনা কথা। তবুও রাতের বিল জলেশ্বর ওর কাছে ভীষণ ভয়ের। এখন সেই বরই গাছের দিকেই সাদেককে হাঁটতে দেখে বুলু আর চুপ করে থাকতে পারে না। সাদেকের হাত জড়িয়ে ধরে বলে– সাদেক ভাই, কনে যাচ্ছো? ওহানে তো ভূত থাহে!

বুলুর কথায় প্রচণ্ড হাসি পায় সাদেকের। কিন্তু এখন হাসির সময় নয়। কারণ ওই বরই গাছের নিচে তখন অপেক্ষা করছি আমি, সাইদ, আরো পাঁচ-ছয় জন মুক্তিযোদ্ধা। আরো কেউ কেউ ছিল হয়ত– এখন মনে করতে পারছি না। ওই এলাকার রাজাকার ক্যাম্প অপারেশন আর সেইসাথে দেশবিরোধী দালালদের খতম করার বিষয়ে আলোচনার জন্য বরইতলায় মিটিং ডাকা হয়েছে।

বুলুর কথার জবাবে সাদেক বলে– বুলু, কী যে বলিস তুই! ভূত বলে কিছু আছে না কি? শোন, ওসব ভূতটুথ কিচ্ছু নেই। সব বোগাস আর কুসংস্কার। তবে–

–তবে কী সাদেক ভাই! –বুলু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করে চাপা গলায়, তাতে বেশ উত্তেজনা।

সাদেক বলে–বুলু, আজকে কিন্তু বরইতলায় সত্যি-সত্যিই ভূত থাকবে। তবে এ ভূত তোমার নাচ-গান করা বোগাস ভূত নয়। এ-ভূত হলো খান সেনা আর রাজাকারদের জান কবচ-করা ভূত– হানাদার পাকবাহিনী আর রাজাকারেরা যাদের বলে মুক্তি, আমরা বলি মুক্তিযোদ্ধা। গেলেই সব দেখতে পাবি।

সাদেকের কথা একটু ঘোরানো হলেও বুলু বুঝতে পারে, বরইতলায় মুক্তিযোদ্ধারা রয়েছেন। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাই আর কিছু না বলে সাদেকের পেছন পেছন নীরবে হাঁটতে থাকে ও।

বরইতলায় পৌঁছতে প্রায় আধ ঘণ্টা লেগে যায়। ওখানে পৌঁছেই ওরা আমাদের দেখতে পায়– অন্ধকারে আট-দশ জন মানুষ বসে আছি আমরা। অন্ধকারে মুখ চেনা যায় না। তবে সবার অবস্থান বোঝা যায়। সাদেকদের দেখেই আমি বলে উঠি: সাদেক ভাই, এসেছো? যার কথা বলেছিলাম, তাকে এনেছো তো?

সাদেক নিচুস্বরে জবাব দেয়– হ্যাঁ, বাবু। আমার সাথে এই যে সে। ওর নাম বুলু– বুলু কাঠুরিয়া। আমার খুব স্নেহের। তোমার মতো আরেক ছোটো ভাই।

এবার আমি উঠে দাঁড়িয়ে বুলুর সাথে হ্যান্ডশেক করি। তারপর হাত ধরে পাশে বসাই। সাদেক ভাইকেও বসতে বলি। এরপর বুলুর হাত ধরে আমি বলি– ভাই বুলু, তুমি এসেছো এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আজ দেশের বড়ো দুর্দিন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের দেশের ওপর আক্রমণ করেছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে এ দেশীয় কিছু বেইমানের দল। ওরা রাজাকার-আল বদর-আল শামস বাহিনী গঠন করেছে, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষদের খতম করার জন্য। আমরা তাদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্যেই অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে নেমেছি। শহর-গ্রামের বহু মানুষ আমাদের সাথে শামিল হচ্ছে। তোমাকেও আমরা আমাদের সাথে চাই। তুমিও হবে এক বীর মুক্তিযোদ্ধা।

বুলু কী বলবে ভেবে পায় না। আমি আবার বলি– শ্রীরামপুর রাজাকার ক্যাম্প খুব তাড়াতাড়ি আক্রমণ করা দরকার। রাজাকারেরা যা শুরু করেছে, তাতে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে ওরা দশ জন মানুষকে বাড়ি থেকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে গুলি করে মেরেছে। ক্যাম্পের সামনের মাঠে বহু গরু আর ছাগল জড়ো করে রাখা হয়েছে। এসবই মানুষের বাড়ি থেকে লুট করে আনা হয়েছে দেশবিরোধী বেইমান রাজাকারদের খাওয়ার জন্য ওগুলো থেকে দু-তিটি প্রতিদিন জবাই করা হয়। যাক সে-কথা। আমরা একটা প্ল্যান করেছি– সেটাই এখন বলছি। আমি চাই বুলু রাজাকার-কাম-কাঠুরিয়া সেজে রাজাকারদের সাথে যোগ দিক। ভালো কাঠুরিয়া হিসেবে সবাই জানে ওকে। ভালো মানুষ। নামাজ-কালামও পড়ে। আমার মনে হয় রাজাকার ক্যাম্পে কাঠ চেরাইয়ের কাজটি সে সহজেই পেয়ে যাবে। কারণ আমার কাছে খবর আছে– ওরা একজন বিশ্বস্ত

রাজাকার-কাম-কাঠুরিয়া খুঁজছে রোজকার রান্নাবান্নার কাজে কাঠ চেরাইয়ের জন্য। ক্যাম্পের পাশের আমবাগানটায় যে বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি আর ডাল জড়ো করা রয়েছে, ওগুলো থেকেই চেরাই করতে হবে জ্বালানি কাঠ। আমাদের লোক দিয়ে কৌশলে ওদের কাছে বুলুর খবরটা দিয়েও দেয়া হয়েছে এরই মধ্যে। দিনচুক্তি না, মাসে মাসে বেশ মোটা বেতন পাবে বুলু। খুব তাড়াতাড়ি ওদের লোক বুলুর কাছে এ কাজের প্রস্তাব নিয়ে যাবে বলে আমাদের ধারণা।

বুলু এবার বেশ উৎসাহী হয়ে ওঠে। বোধ হয় ভাবছে– সে কাঠুরিয়া হয়েছে তো কী হয়েছে! সে-ও দেশের জন্য কাজ করবে। তার ধারালো কুড়ালই হবে তার রাইফেল-কামান-গ্রেনেড। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর মুখটা। কিন্তু কীভাবে কী করতে হবে, তা ওর মাথায় আসছে না। তাই আস্তে আস্তে বলে– কমান্ডার বাবু ভাই আমারে পছন্দ করেছেন, তাতে আমার খুব খুশি লাগতেছে। তবে এ ব্যাপারে ভালো করে এট্টু বুঝায়ে দিলি ভালো হয়। আমি কথা দিচ্ছি, জীবন দিয়ে হ'লিও আমি দ্যাশের ভালোর জন্যি কাজ করব।

এবার আমি সাইদকে বলি– সাইদ, তুমি বুলুকে সব বুঝিয়ে বলো। আমাদের প্ল্যান পুরোপুরি ওকে বুঝিয়ে দিও। আমার বিশ্বাস, সে তার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারবে অ্যান্ড হি উইল বি আওয়ার গ্রেট অ্যাসেট।

সাইদ বলে– বুলু, তোমার কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করছি, দু'-এক দিনের মধ্যেই রাজাকারদের পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রস্তাব যাবে কাঠ চেরাইয়ের কাজ করার জন্য– আগেই শুনেছ সে-ব্যবস্থা আমাদের লোক দিয়ে করা হয়েছে। তা, ধরো তুমি রাজাকার-কাম-কাঠুরিয়ার চাকরিটা নিয়ে নিলে। তখন তুমি ওদের রান্নার কাঠ চেরাই করবে আর ওদের কাজকর্ম, গতিবিধি খেয়াল করবে। তারপর গোপনে নিয়মিত আমাদের কাছে সব খবর পাঠাবে। বুলু, একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো– আমাদের প্ল্যানটা এ-রকম সাদামাটা হলেও আসল কৌশলটা কিন্তু তোমার কাছে। ওখানে ঢোকার পরে তোমার বুদ্ধি আর টেকনিকের ওপরই নির্ভর করবে তোমার সফলতা। ওখানে গিয়ে পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে সব কৌশল ঠিক করতে হবে তোমাকেই। এ-ব্যাপারে তোমার পুরো স্বাধীনতা থাকবে। ঠিক আছে?

> আর আমাদের মাঝেরই কিছু লোক পাকিস্তানি হানাদারদের সাহায্য করার জন্য দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে!

সাইদের কথা শোনার পর বুলু মাথা চুলকায় আর আমতা আমতা করে, মানে সে কিছু বলতে চায়। আমি বিষয়টা লক্ষ করে বলি– কী হলো বুলু? কোনো অসুবিধা?

বুলু বলে–না, কাজ কত্তি কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এট্টা বিষয়ে সমস্যা আছে–

–কী, কী সমস্যা?– আমি জিজ্ঞেস করি। আমার কণ্ঠস্বরে কিছুটা উদ্বেগ।

বুলু আস্তে আস্তে বলে– বাবু ভাই, আমি রাজাকার ক্যাম্পে কাঠুরিয়ার কাজ নেবো, পিলানমতো সব কাজও করব। কিন্তু খতরনাক বেইমান রাজাকার হতি পারব না। ওরা দেশের বিপক্ষে কাজ কত্তেছে। মানুষ আমারে রাজাকার ক'বে– ইডা আমি সহ্য কত্তি পারব না। আমার মূল কাজ তো রাজাকার ক্যাম্পের খবর আপনাগের কাছে পৌঁছানো, ইনশাল্লাহ্ সে-দায়িত্ব আমি ঠিকভাবে পালন কত্তি পারব। ■

শিশুসাহিত্যিক

জাদুর ছাগল

ওয়াহিদ মুস্তাফা

এক ছিল গ্রাম। সেই গ্রামে ছিল এক বন। সেই বনে একদিন একটি ছেলে জ্বালানি কাঠ কাটতে আসে। ছেলেটির নাম তাহসিন। তখন সে বনের মধ্যে একটি কাপ পায়। অনেক পুরনো দিনের চায়ের কাপ।

সে কাপটি ছিল জাদুর কাপ। তাহসিন যখন কাপটি ধরতে যায় তখন কাপটি ছাগলে পরিণত হয়। কালো কুচকুচে তার গায়ের রং।

ছাগল পেয়ে তাহসিন খুব খুশি। সে ছাগলটিকে নিয়ে তার বাড়িতে যায় এবং তার মা-বাবাকে দেখায়। ছাগলটি কথা বলতে পারে। সে বলে– আমি কোনো সাধারণ ছাগল না, জাদুর ছাগল– বলেই সে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। তার তিন সেকেন্ড পর ছাগলটি আবার দেখা দেয়।

এই ঘটনা দেখে সবাই খুব অবাক হয়। তারপর ছাগলটি তাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যায়। সে বাড়ির সব কাজ, যেমন– কাপড় ধোয়া, থালাবাসন ধোয়া, নাশতা বানানো, ঘরদোর পরিষ্কার ইত্যাদি নানান কাজ করে।

কয়েকদিন পর ছাগলটি বাড়ির সবাইকে একটি জাদু দেখায়। জাদুটা হলো: সে একটি গায়েমাখা পাউডার বানায়। সেই পাউডারটি ছাগল তার গায়ে মাখে ও সে অনেক শক্তিশালী হয়ে যায়।

তখন তাহসিনের মা বললেন– যেহেতু তুমি অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছ, তাহলে তুমি দশ কেজি ওজনের একটি চালের বস্তা উঁচু করতে পারবে? তখন ছাগল বলল– হ্যাঁ, পারব। এই বলে সে বস্তা উঁচু করে দেখালো। সবাই তা দেখে অবাক হলো।

কিছুদিন পর ছাগলটি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল। তখন বাড়ির সবাই ছাগলকে ডাকতে লাগল– ও ছাগল! ও ছাগল! একদিন তাহসিনের মা বাড়ির ছাদে কারও হাঁটার শব্দ শুনতে পান। তখন সবাই ছাদে গেলেন। গিয়ে দেখেন সেখানে কিছুই নেই। তখন ছাগল তাহসিনের মাকে দেখতে পায় ও সাথে সাথে দৃশ্যমান হয়। তাকে দেখে সবাই খুব অবাক হলেন। তাহসিনের মা বললেন– বাহ্, খুবই সুন্দর তো! এমনটা তুমি কীভাবে পারলে?

ছাগল কোনো কথা বলে না, শুধু হাসে আর ভ্যা ভ্যা করে গান গায়।

ছাগলটা আসলেই জাদুর ছাগল। ■

দ্বিতীয় শ্রেণি, শিশুকলি নার্সারি স্কুল, বাঘারপাড়া, যশোর

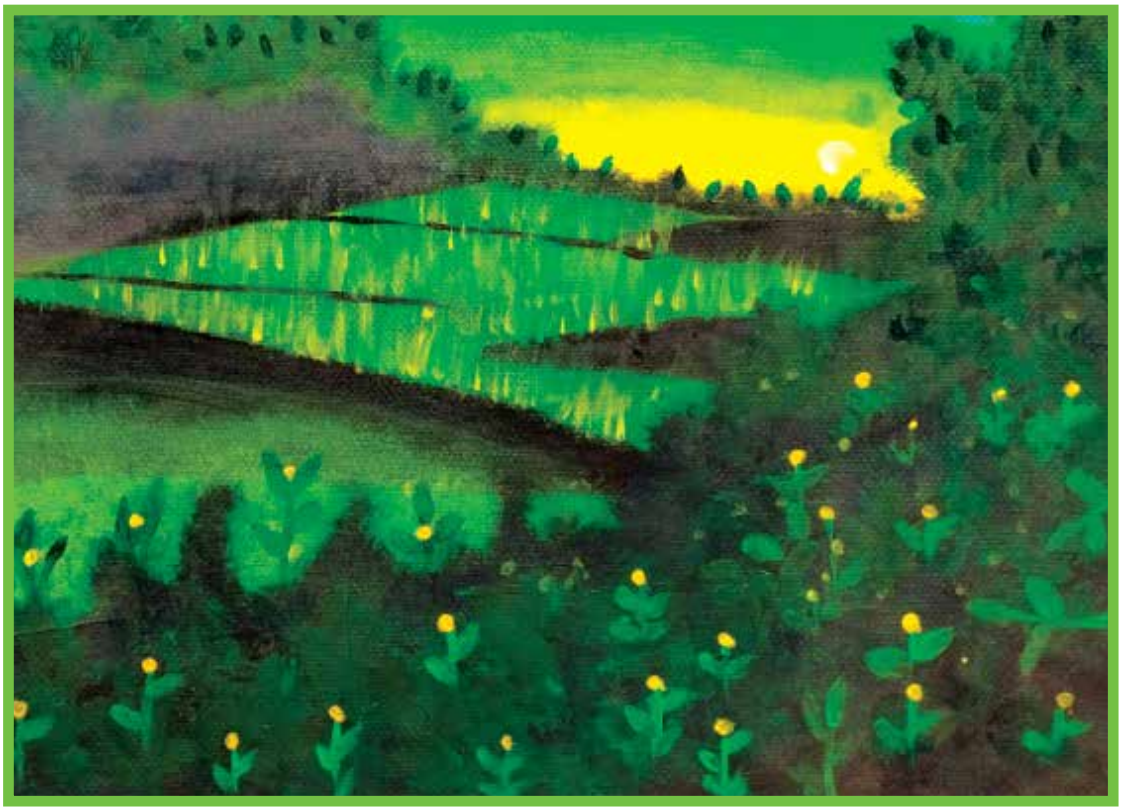

স্বর্ণা রহমান, দ্বাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

দেশ মাতাকে খুঁজে পেয়েছি

সারাফ নাওয়ার

কৈশোরের স্মৃতিগুলো সবারই খুব মিষ্টি-মধুর হয়। তবে আমারটা ভিন্ন। আমার শৈশব একদিকে ঠিক যতটা রোমাঞ্চকর অন্যদিকে ঠিক ততটাই বেদনাদায়ক ও আবেগঘন।

তখন ১৯৭১ সালের মে মাস। থাকি রূপনগর গ্রামে। আমার বয়স তখন পনেরো হবে। গাছগাছালি ঘেরা গ্রামে বেড়ে ওঠা এক দুরন্ত কিশোর আমি। সবসময় ছুটাছুটি করতাম বন্ধুদের সাথে। একদিন মন্টু কাকার দোকানে লোকজনকে আলোচনা করতে শুনি গ্রামে নাকি মিলিটারি এসেছে। তখনো বুঝিনি মিলিটারি কারা! কেটে যায় আরও কিছু দিন। এক রাতের কথা। ঘুমের মধ্যে চিৎকার শুনি, 'আগুন! আগুন!' সাথে সাথে উঠে পড়ি। দেখি সত্যিই আগুনের লেলিহান শিখা চারদিকে। অনেক কষ্টে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। বেরুতে পারেনি শিল্পা। আমার ছোটো বোন। বয়স সাত বছর। ওকে খুব ভালোবাসতাম।

আমার জীবনের সব থেকে প্রিয় আরেকজন মানুষকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। পাঁচ বছর আগে বাবা অসুখে মারা যান। এখন বাকি রইলাম আমি আর মা। বোনটাকেও বাঁচাতে পারলাম না। আমার ভেতরটা ডুকরে উঠল। মায়ের কান্নাটা সহ্য করতে পারছিলাম না। মায়ের কথা কি বলব! আমারই শোকে পাথর হওয়ার মতো অবস্থা। খুব রাগ হলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর উপর। সেদিন বুঝলাম মিলিটারিরা কতটা হিংস্র।

আমি অনিমেষ রায়। হিন্দু পরিবারের সন্তান। হানাদার বাহিনী গ্রামের হিন্দু পাড়াটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত

করেছে। তারা বাড়িঘর সবকিছু পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেকের প্রাণ যায় সেদিন। অনেকের মৃতদেহটাকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। চারদিকে দম বন্ধ করা ধোঁয়ার গন্ধ আর ছাই পড়ে রইল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রামের সবার উপরই অসহনীয় অত্যাচার করত। তবে হিন্দুদের যেন একটু বেশি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিব। পরদিন সকালে মাকে নিয়ে মামারবাড়ি চলে গেলাম। বোনের মৃত্যুশোকে মায়ের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। সবাই মিলে মাকে অনেক কষ্টে সামলেছিলাম। দু'মাস পার হয়ে গেল। মা তখন কিছুটা সামলে উঠেছে। মাকে বললাম যুদ্ধ করব। মা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। পরে অনেক বুঝিয়ে রাজি করেছি। মা যাওয়ার সময় বলেছিল, 'দেশকে স্বাধীন করে তবেই ফিরবি। আর কোনো মায়ের কোল যেন খালি না হয়। আর কারো বুকে যেন কষ্টের বীণ না বাজে। সাবধানে ফিরে আয় বাবা। দোয়া করি। জয়ী হয়ে ফিরে আয়।'

ভারতে গেলাম প্রশিক্ষণ নিতে। দুই মাস ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে এলাম। গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিলাম। মৃত্যু ভয়কে পেছনে ফেলে যুদ্ধ করেছি। প্রতি মুহূর্তেই মনে হতো যেন এটাই জীবনের শেষ ক্ষণ। দেখতে দেখতে চলে এল ১৬ই ডিসেম্বর। হানাদার বাহিনী সারেন্ডার করল। জিতে গেলাম স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ। লাভ করলাম লাল-সবুজের পতাকা। সেদিন মনটা আনন্দে ভরে উঠল। যেন বোনের হাসিটা দেখতে পেলাম। সাথে মাকেও খুব মনে পড়ল। ফিরে গেলাম মামার বাড়ি। কিন্তু ঘরে গিয়ে দেখি কেউ নেই। পুরো বাড়িটাই ফাঁকা। বুকের ভেতরটা যেন আরেকবার মোচড় দিয়ে উঠল। একেবারে একা হয়ে গেলাম আমি। বেঁচে থেকেও যেন মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম। স্বাধীন দেশের এত আনন্দের মধ্যেও যেন বেদনা আমার পিছু ছাড়ল না। তবে একটাই সান্ত্বনা মায়ের বলা কথাগুলো পালন করতে পেরেছি। একদিকে গর্ব হচ্ছিল দেশকে স্বাধীন করার আনন্দে অন্যদিকে কষ্ট হচ্ছিল পরিবারের সবাইকে হারিয়ে। জানি না কীভাবে সামলে ছিলাম নিজেকে। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল। আজও শিহরিত হই সেই দিনগুলোর দিকে তাকালে। তবে আমি গর্বিত যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। সেদিন মাকে খুঁজে না পেলেও দেশমাতাকে খুঁজে পেয়েছি। সেটাই বা কম কী! ■

দশম শ্রেণি, কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

স্বরণিকা সাহা, পঞ্চম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, ঢাকা

বিজয়ের রঙে রঙিন

পৌষ মাসের ২ তারিখ কুয়াশার আবরণে চারদিক ঢাকা। সকালের আড়মোড়া ভেঙে ছোটো ছোটো বন্ধুরা চলে আসে তথ্য ভবনে। তাদের কোলাহলে আর কিচিরমিচিরে ভবন মেতে উঠে। রঙিন সাজে বাবা-মা আর অভিভাবকের সাথে নিয়ে এসব ফুলকলিরা এসেছিল চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৭ই ডিসেম্বর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজন করেছিল শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ।

সকাল ১০টায় প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার সময় নির্ধারণ করা হলেও সময়ের অনেক আগেই বন্ধুরা চলে আসে। দুদিন আগে রেজিস্ট্রেশনের করে সঙ্গে আনা রংতুলি নিয়ে বসে যায় তথ্য ভবনের উঠানে। সেখানে বন্ধুদের জন্য আগেই পেতে রাখা হয়েছিল গালিচা। সব বয়সের বন্ধুরা এসেছিল। তাই আয়োজকরা বয়স ভেদে দুটি গ্রুপে

ভাগ করে নেয়। ক গ্রুপে ছিল নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত, খ গ্রুপ ছিল পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। ঘড়ির কাটা দশটায় ছুঁয়ে ফেলতেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তার আগে বন্ধুদের দেয়া হয় ছবি আঁকার কাগজ। প্রতিযোগিতার বিষয় 'মুক্তিযুদ্ধ আর বিজয় দিবস'। সময় হতেই সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করে। সময় চলে আপন নিয়মে। এক সময় প্রতিযোগিতা শেষ হয়।

এরপর শুরু হয় বিচারকদের চুলচেরা বিশ্লেষণ। রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী প্রতিযোগী এসেছিল প্রায় ৮০-৮৫ জন । প্রতেকেই ছিল ভালো আঁকিয়ে। রং আর তুলির আঁচড়ে সবাই যেন হয়ে উঠেছিল যোদ্ধা। এই প্রজন্ম যুদ্ধ দেখেনি, শুনেছে দাদা-দাদি, নানা-নানি অথবা কারো কাছে। শোনা কথাগুলো তুলিতে হয়ে উঠেছিল জীবন্ত। মনের রেখাপাত রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল কাগজের ক্যানভাসে। মনে হচ্ছিল যেন তারা ছবিগুলো দেখে কোন ছবি রেখে কোন আনবে। কিন্তু ক গ্রুপ থেকে তিনজন,

মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে। আঁকা বিচারকরা তো বিপদে পড়ে যান। ছবিকে শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় প্রতিযোগিতার নিয়মে বিচারকরা আর খ গ্রুপ থেকে তিন জনের ছবি বাছাই করে। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলো: ক গ্রুপ; আভা আনজুম সুবাহ(১ম), মানহা বিনতে মবিন(২য়) নাজিবা জন্নাত(৩য়)। খ গ্রুপ: জায়ীফা তাসনীম(১ম), তামজীদ এ নূর(২য়) রাইশা ফারিহা (৩য়)। তবে খালি হাতে ফিরে যায়নি কেউ। সবার জন্যই ছিল সার্টিফিকেট, কালার বক্স, ছোটোদের প্রিয় নবারুণ।

বিকেলে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে মেডেল, সার্টিফিকেট আর সম্মানী তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ হুমায়ূন কবীর খোন্দকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স.ম. গোলাম কিবরিয়া। ■

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

FIFA WORLD CUP Qatar2022

আছি আমরাও

প্রতি চার বছর পর বিশ্বের নানা প্রান্তে মহাসমারোহে ফুটবল মহাযজ্ঞের আসর বসে। ফুটবল বিশ্বকাপের ৯৮তম আসরে সাতটি মহাদেশ থেকে বাছাইকৃত বত্রিশটি দেশ নিয়ে মরুর দেশ কাতারে বসে ফুটবলের সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ আসর কাতার বিশ্বকাপ-২০২২। বিশ্বকাপকে ঘিরে কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী উন্মাদনায় মেতে ওঠে । আর সারা বিশ্বকে ছাপিয়ে যায় ফুটবলপ্রেমী বাঙালির আবেগ-উচ্ছ্বাস আর প্রাণোচ্ছলতা।

চলতি কাতার বিশ্বকাপে দল হিসেবে মাঠে নেই বাংলাদেশ। সরাসরি না খেললেও বিশ্বমঞ্চের এই মহারণে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্টেডিয়াম নির্মাণের মতো বিষয়গুলোতে যুগান্তকারী ভূমিকার কারণে কাতার সরকার 'ফ্ল্যাগ প্লাজায়' উড়িয়েছে লাল-সবুজের গৌরবোজ্জ্বল পতাকা। এ সম্মান-স্বীকৃতি বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে দান করেছে অনন্য মর্যাদা। বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে মরুর দেশে আসা লাখো কোটি পর্যটক ও কর্মকর্তাদের পরিবহণ, আবাসন, নিরাপত্তা এবং আতিথেয়তায় নিয়োজিত আছে ২০ লাখের বেশি বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারী। মেইড ইন বাংলাদেশ লেখা ৬ লাখের বেশি টি-শার্ট বিশ্বকাপে নিয়োজিত রেফারি, কর্মকর্তা, বল বয়েজ ও হাজারো দর্শকদের পরনে ছিল। বাংলাদেশের মেয়ে আয়েশা পারভীন কাতার বিশ্বকাপের অন্যতম আলোচিত কন্টেইনারবাহী স্টেডিয়াম ৯৭৪-এ চিকিৎসক। বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিচালনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রেফারিং কো-অর্ডিনেটর হিসেবে আছেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্তান শওকত আলি। আল রায়ান শহরে অবস্থিত বিশ্বকাপের অন্যতম স্টেডিয়াম 'এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম' নির্মাণে প্রকৌশলী হিসেবে ওয়াশিকুর রহমান শুভর অবদান বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ১৫ লাখ পর্যটককে স্বাগত জানাতে কাতারের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ভাষাগত দক্ষতায় অভিজ্ঞ বহু বাংলাদেশি নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া স্টেডিয়ামের সৌন্দর্যবর্ধন, ব্র্যান্ড নিউ সিটি হিসেবে লুসাইল সিটির ভিত্তি স্থাপনেও জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের নাম।

এছাড়া ফুটবলপাগল বাংলাদেশিদের ফুটবল উন্মাদনার খবর, নজর কেড়েছে সমগ্র বিশ্বের। বিশেষত, ল্যাটিন ফুটবল জায়ান্ট ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার প্রতি বাঙালির বাধভাঙা সমর্থন দেশগুলোতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। লিওনেল মেসির হাতেও শোভা পেয়েছে লাল-সবুজের পতাকা। মেসির দেশ কিংবা স্টেডিয়াম সবখানেই আর্জেন্টাইন নাগরিকদের হাতে শোভা পায়ে বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা। অন্যদিকে পেলের দেশ ব্রাজিলও বাংলাদেশ বন্দনায় পিছিয়ে নেই। । ব্রাজিলিয়ান গোলকিপার এডারসনের পরিবারকে দেখা গেছে স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের পতাকা হাতে, 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' বলে স্লোগান দিতে। অনেক ব্রাজিল সমর্থককে বাংলাদেশের পতাকা হাতে উচ্ছ্বসিত মুহূর্তের ছবি শেয়ার আমাদের করেছে গর্বিত। ফুটবলের এই বিশ্ব আসরে বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইল জুড়ে হিড়িক পড়ে যায় ফুটবল উৎসব উদযাপনের। বাঙালি হয়ে উঠে বিশ্ব সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র। বিশ্বকাপ ফুটবল আসরে ক্রীড়াশৈলি প্রদর্শনের সুযোগ না পেলেও বিভিন্ন সম্পৃক্তায় কাতার বিশ্বকাপ স্বদেশকে পৌঁছে দিয়েছে অন্য এক উচ্চতায়। ■

প্রতিবেদন: ফারুক আহম্মেদ খান

জাতীয় স্মৃতিসৌধের ইতিহাস

জাতীয় স্মৃতিসৌধ জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের স্মরণে নিবেদিত এবং শহিদদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সাভারে নির্মিত এই সৌধ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম স্মৃতিসৌধ। স্মৃতিসৌধ আমাদের অস্তিত্ব আর জাতীয়তাবোধের প্রতীক। এটি শুধু মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মৃতি স্মরণের জন্যই নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের আরো ইতিহাস। একটি স্বাধীন দেশের নেশায় বাংলার নারী-পুরুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধে, ছিনিয়ে এনেছে বিজয়। তাই বীর বাঙালির গৌরবগাঁথা সংগ্রাম ও বিজয়ের প্রতীক হিসেবে দণ্ডায়মান 'জাতীয় স্মৃতিসৌধ'।

১৯৭১ এর ডিসেম্বরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ,মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত বিজয়,তাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ স্মরণ করে স্মৃতি সৌধ সাভারে নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে নবীনগরে এই স্মৃতি সৌধের শিলান্যাস করেন। ৫৭টি সেরা নকশার মধ্য থেকে স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেনের নকশাকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৮২ সালের কিছু পর স্মৃতিসৌধের মূল কাঠামো, কৃত্রিম লেক এবং উদ্যান তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়।

স্মৃতিসৌধের সর্বোচ্চ বিন্দুর উচ্চতা ১৫০ ফুট বা ৪৫ মিটার। একেক দিক থেকে সৌধটি একেক রকম ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। স্থপতি মইনুল হোসেন সৌধের মূল কাঠামোটি কংক্রিটের এবং কমপ্লেক্সের অন্যান্য স্থাপনা লাল ইট তৈরি করেন। মূল সৌধ থেকে পার্থক্য করার জন্যই এটি করা হয়েছে। এর দ্বারা রক্তের লাল জমিতে স্বাধীনতার স্বতন্ত্র উন্মেষ নির্দেশ করা হয়েছে । পুরো এলাকাটি ৩৪ হেক্টর নিয়ে নির্মিত। এর চারপাশে আরো ১০ হেক্টর জায়গা জুড়ে রয়েছে সবুজ ঘাসের বেষ্টনী। এই সবুজ বেষ্টনী সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের প্রতীক। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস সহ বিশেষ জাতীয় দিবসে এখানে লাখো জনতার ঢল নামে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধের সাত জোড়া ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি ভিন্ন পর্যায় নির্দেশ করে। পর্যায়গুলো হলো : * ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন; * ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন; * ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন; *১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন; *১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন *১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান; * ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

প্রতিবেদন: ইকবাল রেজা

মানহা মামুন নামীরা, প্রথম শ্রেণি, YWCA উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গ্রিন রোড, ঢাকা

ভারতের বিপক্ষে সিরিজ জয়

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ক্রিকেটের পরাশক্তি ভারতের বিরুদ্ধে টাইগারদের এমন জয় বিশ্ববাসী দেখল ৭ বছর পর। উত্তেজনাপূর্ণ দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত হারল ৫ রানে। শেষ ওভারে জয়ের জন্য ভারতের দরকার ছিল ২০ রান। ম্যাচটি ঝুলছিল দুই দলের দিকেই। অধিনায়ক লিটন দাস শেষ ওভারের জন্য অভিজ্ঞ মুস্তাফিজের হাতে বল তুলে দেন। প্রথম ৪ বলে মুস্তাফিজ দেন ৮ রান, শেষ ২ বলে দরকার ১২। কিন্তু পঞ্চম বলে ছক্কা হাঁকান রোহিত শর্মা। শেষ বলে দরকার আরেকটি ছয়। দেশ সেরা পেসার মুস্তাফিজ দারুণ দক্ষতায় শেষ বলটি করেন। বলটি রোহিতের পায়ে করায় ১ রানের বেশি নিতে পারেননি ভারতীয় অধিনায়ক। আর তাতেই ৫ রানের এক দারুণ জয় পেল টাইগাররা।

৭ই ডিসেম্বর মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে শুরু হয়। টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে মহাবিপদে পড়ে বাংলাদেশ দল। স্কোরবোর্ডে ৬৯ রানে সাজ ঘরে ফেরেন ছয় ব্যাটসম্যান। এরপর মেহেদী মিরাজকে সাথে নিয়ে হাল ধরেন অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ১৬৫ বলে ১৪৮ রানের জুটি গড়ে দলকে টেনে তোলেন তারা। দলীয় ২১৭ রানের মাথায় ৯৬ বল খেলে ৭৭ রান করে ফিরে যান মাহমুদউল্লাহ। ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের কোনো জুটির এটাই সর্বোচ্চ রান। এরপর লেগ স্পিনার নাসুম আহমেদকে নিয়ে হাল ধরেন মিরাজ। ২৩ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন তারা। তাতেই বাংলাদেশ পেয়ে যায় চ্যালেঞ্জিং পুঁজি । পাশাপাশি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিও তুলে নেন মিরাজ। শত রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। এছাড়া দলের প্রয়োজনের সময় ১১ বলে কার্যকর ১৮ রান করে অপরাজিত থাকেন নাসুম আহমেদ।

বল হাতেও জ্বলে ওঠে বাংলাদেশের বোলাররা, নিয়মিত ভারতের উইকেট তুলে নেন তারা। ৩৯ রানে ভারত ৩ উইকেট হারায়। পরে হাল ধরেন কে এল রাহুল ও শ্রেয়াস আইয়ার। তাদের জুটিতে আসে ২৬ রান। দলীয় ৬৫ রানের মাথায় কে এল রাহুল ফিরে যান ১৪ রানে। এরপর আক্সার প্যাটেলকে সাথে নিয়ে ১০১ বলে ১০৭ রানের জুটি গড়েন শ্রেয়াস আইয়ার। দলীয় ১৭২ রানের মাথায় শ্রেয়াস আইয়ার ফিরে যান ব্যক্তিগত ৮২ রানে। তারপর আক্সার প্যাটেলও বেশি সময় ক্রিজে টিকতে পারেননি। ১৮৯ রানের মাথায় ৫৬ রান করে সাজ ঘরে ফিরে যান তিনি। শেষ দিকে অধিনায়ক রোহিত শর্মার ২৮ বলে ৫১ রানেও ভারত পরাজয় এড়াতে পারেনি।

বাংলাদেশের পক্ষে ৩ উইকেট শিকার করেন এবাদত হোসেন, ২টি করে উইকেট পান সাকিব ও মিরাজ এবং ১টি করে উইকেট তুলে নেন মুস্তাফিজ ও মাহমুদউল্লাহ। সেঞ্চুরি ও ২ উইকেট নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন মেহেদী হাসান মিরাজ।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

জয়ের স্বর্ণপালক

'এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২২' প্রতিযোগিতায় পাওয়ার লিফটিংয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন বাংলাদেশের রাইয়ান রহমান। টুর্নামেন্টে সাব-জুনিয়র অনূর্ধ্ব ৫৯ কেজি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৪৭২.৫ কেজি উত্তোলন করে জয়ের মুকুটে নতুন পালক যুক্ত করেন রাইয়ান। এছাড়া তিনি স্কোয়াট এবং ডেডলিফটে স্বর্ণ এবং ব্যেঞ্চপ্রেসে রৌপ্য পদক অর্জন করেছেন। ২রা ডিসেম্বর দুবাইতে অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে আনেন তিনি। বিশ্বমঞ্চে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত ১৮ বছর বয়সি এই তরুণ।

দুবাইতে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়ানশীপ ২০২২' তে বাংলাদেশের ৯ পাওয়ার লিফটার সহ এশিয়ার ২৯টি দেশের প্রায় ৫০০ পাওয়ার লিফটার অংশগ্রহণ করেন। এর আগে তুরস্কে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়ানশীপ ২০২২' তে রাইয়ান রহমান ৪৫০ কেজি উত্তোলন করে ৪র্থ স্থান অর্জন করেছিলেন। আগে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করলেও স্বর্ণপদক অর্জন করার ঘটনা এবারই প্রথম।

পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সুযোগ পাওয়ার আগ পর্যন্ত রাইয়ানকে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। চ্যালেঞ্জের শুরুটা হয়েছিল ২০১৯ সালে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতেই প্রথম জিমে যাওয়া শুরু করেন তিনি। ধীরে ধীরে সব প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে বর্তমান অবস্থানে এসেছেন। তার এই লম্বা পথচলায় সঙ্গী ছিলেন কোচ তাহসিন আলী। তার পরামর্শেই রহিয়ান ন্যাশনাল পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১-এ। অভিষেকেই রাইয়ান রানার আপ হয়। মূলত এরপর আর তাকে কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

প্রতিবেদন: সিরাজ সালেহীন

সাজ্জাত হোসেন শান্ত
তৃতীয় শ্রেণি
দক্ষিণ-পূর্ব মহিট ভাংগা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডে বাজিমাত

জার্মানিতে আয়োজিত বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক রোবোটিকস প্রতিযোগিতা 'ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড ২০২২'-এ অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। জার্মানির ডর্টমুন্ডে আজ শুরু হওয়া তিন দিনের এ আসরে বাংলাদেশ থেকে 'টিম লেইজি-গো' এবং 'রোবোনিয়াম বাংলাদেশ' নামের দুটি দল অংশ নেয়। প্রথমবারের মতো সরাসরি অংশ নিয়েই রোবোটিকস প্রতিযোগিতা ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড ২০২২-এ তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন বাংলাদেশের চার শিক্ষার্থী।

বিশ্বের সম্মানজনক এই রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স বিভাগে বাংলাদেশের টিম 'লেজি-গো' অর্জন করে এই সম্মাননা। সেখানে মোট অংশগ্রহণকারী দল ছিল ২৪টি। এছাড়া 'রোবোনিয়াম বাংলাদেশ' নামে একটি দল ফিউচার ইনোভেটরস বিভাগে অষ্টম স্থান অর্জন করেছে। টিম লেজি- গো দলে অংশগ্রহণকারীরা হলেন, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের তথ্য এবং যোগাযোগ প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী ইকবাল সামিন এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির সফটওয়্যার প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী তওসিফ সামিন।

রোবোনিয়া বাংলাদেশ দলের সদস্যরা হলেন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ রংপুরের শিক্ষার্থী ইসরাফিল শাহীন এবং মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থী মীর মুহাম্মদ আবিদুল হক। এই আসরে বাংলাদেশ দলের দলনেতা এবং উপদলনেতা হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে রেদওয়ান ফেরদৌস ও মাহেরুল আজম কোরেশী।

প্রসঙ্গত, বিশ্ব রোবট অলিম্পিয়াড-২০২২ বাংলাদেশের জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবরে ঢাকার আহছানউলাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী দল নির্বাচনী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে সাফল্য এবং পারদর্শিতার ওপর ভিত্তি করে বিশ্ব রোবট অলিম্পিয়াড-২০২২-এ বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্বকারী দল নির্বাচন করা হয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

আইজেএসও প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ

কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোতায় অনুষ্ঠিত ১৯তম আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডে (আইজেএসও-২০২২) ৪টি ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে বাংলাদেশ দল। ৪০টি দেশের অংশগ্রহণে অনূর্ধ্ব-১৬ বয়সিদের আন্তর্জাতিক এই অলিম্পিয়াডটি গত ২-১২ অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বরে। এতে ৬ সদস্যের বাংলাদেশ দল অংশ নিয়ে চারজনই পদক অর্জন করে। ১১ই ডিসেম্বরে বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেয়া হয়। করোনা মহামারির পর এবারই সরাসরি আইজেএসও অনুষ্ঠিত হল।

বাংলাদেশের পক্ষে পদক জয় করেন, খুলনা জিলা স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী এস. এম. আব্দুল ফাত্তাহ ও কাজী নাদিদ হোসেন, ঢাকার উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী আজমাঈন আদিব এবং বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. নাফিজ নূর তাম্বিন। ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকার চল্লিশটি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তারা এই পদক অর্জন করে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত এই

আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল অষ্টমবারের মত অংশ নিয়েছে। ৩রা ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই অলিম্পিয়াডে শিক্ষার্থীরা এমসিকিউ, থিওরি ও ব্যবহারিক অংশের পরীক্ষা দেয়। এর আগে গত সাত বছরে বাংলাদেশ দল ১২টি রৌপ্য ও ১৭টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছিল।
চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে আইজেএসও-তে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ দল। বাংলাদেশের এই সাফল্য আমাদেরকে গর্বিত করে।

প্রতিবেদন : আব্দুর রহমান

নতুন পোলিও টিকা

মুখে খাওয়ার নতুন পোলিও টিকা (এনওপিভি২) নবজাতকদের জন্য নিরাপদ এবং তাদের মধ্যে সফলভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরিতে সক্ষম বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ। বিজ্ঞানভিত্তিক জার্নাল দ্য ল্যানসেট এ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
আইসিডিডিআর,বি ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ১৬ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত চাঁদপুরে অবস্থিত মতলব হেলথ রিসার্চ সেন্টারে একটি র‍্যান্ডমাইজড, ডাবল-ব্লাইন্ড, কন্ট্রোল্ড, ফেজ-২ ট্রায়াল পরিচালিত হয়। গবেষকগণ তিন মাসের গর্ভাবস্থায় রয়েছেন এমন নারী এবং তাদের নবজাতকদেরকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করেন। গবেষণায় নবজাতকদেরকে চার সপ্তাহের ব্যবধানে এনওপিভি-২ টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার পর তাদের সংবেদনশীলতা, সহনশীলতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে এনওপিভি-২ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সক্ষম; এবং ৯৯ শতাংশ নবজাতকের মধ্যে রোগ প্রতিরোধমূলক নিউট্রিলাইজিং অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে।
মুখে খাওয়ার পোলিও টিকায় (ওপিভি) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করার জন্য জীবন্ত কিন্তু ক্ষতি করতে অক্ষম পোলিওভাইরাস ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র বিরল কিছু ক্ষেত্রে, প্রচলিত ওপিভি-তে ব্যবহৃত টাইপ-২ পোলিওভাইরাস বিবর্তিত হয়ে সংক্রমণ ঘটাতে পারে এবং স্নায়ুতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে গ্লোবাল পোলিও ইরাডিকেশন ইনিশিয়েটিভ মুখে খাওয়ার পোলিও টিকা থেকে টাইপ-২ পোলিওভাইরাস বাদ দিয়েছে এবং শুধুমাত্র টাইপ-১ এবং টাইপ-৩ পোলিওভাইরাস মোকাবেলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা টাইপ-২ পোলিওভাইরাস প্রতিরোধের জন্য এনওপিভি২ নামক একটি মুখে খাওয়ার পোলিও টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে, যার মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রের রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা কম। টিকাটি পূর্বে যারা ইন্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাক্সিন (আইপিভি)-র অন্তত একটি ডোজ পেয়েছে তাদের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে এটির মাধ্যমে পুণরায় সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা পূর্বের প্রচলিত মুখে খাওয়ার টিকার চেয়ে কম। এজন্য নবজাতক, যারা পোলিও সংক্রমণের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাদের নিয়ে করা এই নতুন গবেষণার ফলাফল জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য পোলিও নির্মূলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই গবেষণার ফলাফলকে পোলিও মুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

থ্রিএমটি পুরস্কার আতিয়ার

থ্রি মিনিট থ্রিসিস (থ্রিএমটি) প্রতিযোগিতায় কালাজ্বরের কার্যকর ওষুধ তৈরির মতো একটা জটিল বিষয় তিন মিনিটে বর্ণনা করে প্রথম স্থান অর্জন করেন বাংলাদেশের মেয়ে আতিয়া বিনতে আমিন। এই বছর কানাডায় ৪৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিয়া প্রথম হন।

প্রতিযোগিতার নাম থ্রি মিনিট থিসিস (থ্রিএমটি)। এটাতে একজন প্রতিযোগীকে তিন মিনিটের মধ্যে তার স্নাতক গবেষণার বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে হয়। সেই বর্ণনাও হতে হয় এমন যেন সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে। কালাজ্বরের যেসব ওষুধ আছে, তার অর্ধেকেরও বেশি ক্ষেত্রে পরজীবীটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। কানাডার মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এ রোগ মাত্র তিন মিনিটে উপস্থাপন, সেই সঙ্গে গবেষণার ফলাফল ও গুরুত্ব একটি ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরা ছিল আতিয়ার জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ। তিনি দেখিয়েছেন। দেহে কালাজ্বরের ওষুধ কাজ না করলে, নতুন কার্যকর ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা না করালে ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে এই রোগে মৃত্যু অবধারিত। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'থ্রি মিনিট থিসিস' নামের এই প্রতিযোগিতা বিশ্বের প্রায় ৮৫ টি দেশে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী আঞ্চলিক পর্বেও আতিয়া প্রথম হয়। পাশাপাশি দর্শকদের ভোটে পান 'পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড'।

২৯ বছর বয়সি আতিয়া ময়মনসিংহের মেয়ে। বর্তমানে কানাডার মনট্রিয়লে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবদেহের জিনতত্ত্বের ওপর পিএইচডি করছেন। কালাজ্বরের জন্য কীভাবে কার্যকর ওষুধ তৈরি করা যায় তা নিয়ে আরো কয়েকজনের সঙ্গে একত্রে গবেষণা করছেন আতিয়া।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

ফারানাজ সিদ্দিকী, দশম শ্রেণি, স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ

কাদা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি

নদী, পুকুর ও ডোবার কাদা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে আমাদের এক বন্ধু। তার নাম সাইদুর রহমান। তিনি ভোলার পৌর এলাকার চরনোয়াবাদ মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। ২৩শে নভেম্বর ভোলা সদর উপজেলার চত্বরে অনুষ্ঠিত ৪৪তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অলিম্পিয়াড মেলায় নিজের এ উদ্ভাবন প্রদর্শন করেন তিনি। সাইদুর ও তার সহপাঠী মিলে অনেকদিন ধরেই নতুন কিছু তৈরি করার পরিকল্পনা করে আসছিল। এই ধারাবাহিকতায় তারা কাদা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনা করেন। সাইদুর রহমানের উদ্ভাবিত কাদা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য লাগবে ৪টি পাত্র। পাত্রগুলোতে নদী, পুকুর বা যে-কোনো স্থানের কাদা রাখতে হবে। এরপর ওই পাত্রে কয়েকটি দস্তার টুকরো দিতে হবে। এতেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। সবশেষে কার্বন দণ্ডের সাথে তারের সংযোগ করে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে কোনো খরচ ছাড়াই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে। এই উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে বাল্ব, ফ্যানসহ সবকিছুই চালানো যাবে।

৬ মাসে দেশ বদলায় যে দ্বীপ

তোমরা ঘুমালে এক দেশে আর ঘুম থেকে উঠে দেখলে অন্য দেশের অধীনে আছ তখন কেমন হবে বলো তো বন্ধুরা? পৃথিবীতে এমন একটি দ্বীপ রয়েছে যেখানে তোমার হতে পারে এমন একটি অভিজ্ঞতা। যা বছরের ৬ মাস থাকে এক দেশের অধীনে বাকি ৬ মাস থাকে অন্য দেশের অধীনে। এমন আজব দ্বীপ পৃথিবীতে একটিই। নাম ফেজেন্ট আইল্যান্ড (PHEASANT ISLAND)। ফ্রান্স ও স্পেনের যৌথ মালিকানায় এ দ্বীপ ৬ মাস থাকে স্পেন সরকারের অধীনে আর বাকি ৬ মাস থাকে ফ্রান্সের মালিকানায়। ফ্রান্স ও স্পেনকে আলাদা করেছে বিডাসোয়া নামের একটি নদী। এই নদীর মাঝখানেই জনবসতিহীন সুন্দর এই দ্বীপ। যখন যে দেশের অধীনে থাকে তখন সেই দেশ এর রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ দ্বীপের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মিটার এবং প্রস্থ ৪০ মিটার। ১৬৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর ৩০ বছর ধরে চলা যুদ্ধ শেষে স্পেন ও ফ্রান্সের শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ফেজেন্ট দ্বীপকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করা হয়। জনমানবহীন এই দ্বীপে রয়েছে অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণী লেখা স্তম্ভ। এ দ্বীপে সাধারণ মানুষ, পর্যটক এমনকি এই দু'দেশের নাগরিকদেরও যাওয়ার অনুমতি নেই। বছরের পর বছর যৌথ শাসনে শান্তির প্রতীক হয়ে টিকে আছে ঐতিহাসিক এই দ্বীপ ফেজেন্ট আইল্যান্ড।

রোবট মাছ

দেখতে মাছের মতো। পানিতে ছেড়ে দিলে সাঁতরাতেও পারে। তবে এই মাছ জীবিত নয়। যন্ত্র দিয়ে তৈরি শরীর। এটি একটি রোবট মাছ। নাম তার গিলবার্ট। ইংল্যান্ডের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক ছাত্র মাছটি বানিয়েছেন পানিকে প্লাস্টিক কণার দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে। প্লাস্টিকের অত্যন্ত ছোটো ছোটো কণা, যার আরেক নাম মাইক্রো প্লাস্টিক কণা। আকারে এতটাই ছোটো যে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানি পান করার সময় চোখে পড়ে না। সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি এই যন্ত্র মাছ পানিকে এই প্লাস্টিককণা মুক্ত করতে পারবে বলে জানিয়েছেন উদ্ভাবকরা। যন্ত্র দিয়ে তৈরি এ রোবট মাছ অসম্ভবকে সম্ভব করবে। পানিতে ছেড়ে দিলে ওই মাইক্রো প্লাস্টিককে গিলে নিয়ে শুদ্ধ পানি পেট থেকে ছেঁকে বের করবে রোবট গিলবার্ট। গিলবার্টের শরীরের ভিতরের গঠনও খানিকটা মাছের মতোই। যান্ত্রিক কানকোও আছে তার। সেই কানকোর ছাঁকনিতেই মাইক্রো প্লাস্টিক ছেঁকে পানি পরিষ্কার করে গিলবার্ট।

৫০০ মিটার লম্বা কোরানশরিফ

আজ জানাবো ভারতের নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরের এক তরুণ মুস্তফা জামিলের কথা। ২৭ বছর বয়সি এ তরুণ নিজ হাতে লিখেছেন ৫০০ মিটার লম্বা কোরানশরিফ। গড়েছেন বিশ্বরেকর্ড। আল কোরানশরিফকে ভালোবেসে এর অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি। জামিল কোরানের চারপাশের নকশাও করেছেন নিজ হাতেই। হুবহু ছাপা অক্ষরের মতো দেখতে তার লেখা এ পবিত্র গ্রন্থ নজর কেড়েছে সবার। পুরো কোরানশরিফ লিখতে তিনি ব্যবহার করেছেন ১৬৪০ ফিট দীর্ঘ একটি কাগজ। লেখা সম্পন্ন করতে তার সময় লেগেছে প্রায় ৬ মাস। ৫০০ মিটার দীর্ঘ এ কাগজের প্রস্থ ১৪.৫ ইঞ্চি চওড়া। কাগজটিকে ৪৫০ পাতায় ভাগ করা হয়েছে। লিখতে ব্যবহার করা হয়েছে লাল, কালো ও সবুজ তিন ধরনের কালি। বর্তমানে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের একটি মসজিদে এই কোরানশরিফ রাখা হয়েছে প্রদর্শনীর জন্য।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ছোটোদের আঁকা

আমিরা হক, প্রথম শ্রেণি, ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

মোসা. জীম আক্তার, তৃতীয় শ্রেণি, পাইকগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

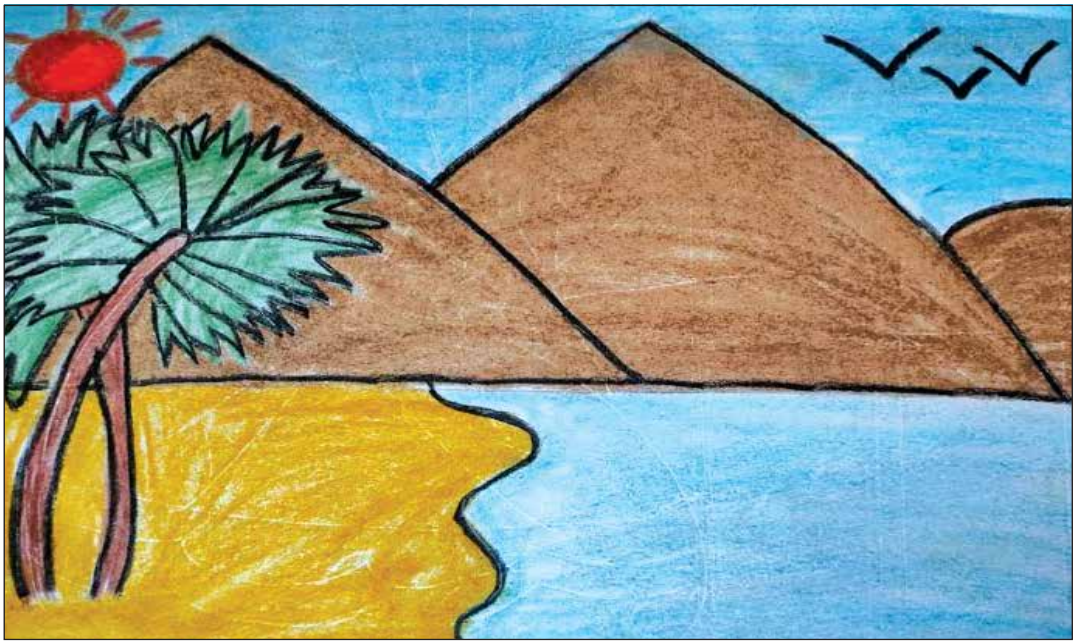

জারিন তাসনিম জেবা, চতুর্থ শ্রেণি ক্যালিক্স প্রি-ক্যাডেট স্কুল, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

নাজিবা জান্নাত, প্লে শ্রেণি, লিটল এঞ্জেলস স্কুল, ঢাকা

রাইশা ফারিহা, ষষ্ঠ শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল

আভা আনজুম সুবাহ, চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-06, December 2022, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

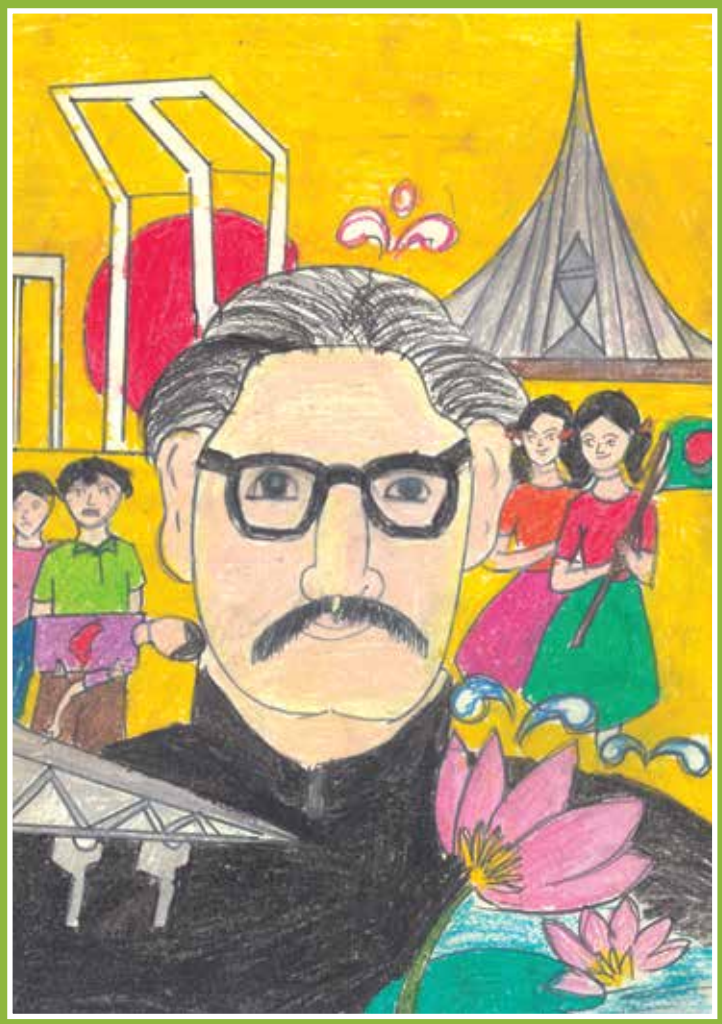

মানহা বিনতে মমিন, চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা